আফগানিস্থান

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

পর্যটক প্রকাশনা ভবন
১৫৬ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

আফগানিস্থান

নীরব দেশকর্ম্মী

আমার স্বগ্রামনিবাসী

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দেব

মহাশয়ের করকমলে

অর্পণ করলাম

রামনাথ

ভূমিকা

আফগানিস্থান ভ্রমণ করার সময় যা দেখেছি এবং শুনেছি তাই এই বই-এ লিখেছি।

১৯১৯ সালের মে মাসে আফগানিস্থান একটি বাফার স্টেটে পরিণত হয়। আফগানিস্থানের জনসাধারণের মনেও রাষ্ট্রীয় চেতনা বিশেষ পুষ্টি লাভ করেনি। আফগানিস্থানকে প্রগতিশীল দেশ বলা চলে না। রক্ষণশীলতা ও সনাতন আচার-পদ্ধতির বেড়াজাল ছাড়িয়ে যেতে যে-পরিমাণ শিক্ষা ও আন্দোলনের আবশ্যক আফগানিস্থানে তার অভাব দেখলাম। রাজা আমান উল্লা ও বাচ্চা ই-সাক্কো নতুন জগতের নতুন ধারায় দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে অবসর তাঁরা পাননি। যাই হোক, আজো যে-পরিবর্তন ও উন্নতি আফগানিস্থানে আসেনি একদিন হয়তো তা আসবে, আফগানিস্থানের জনসাধারণ চারদিককার জগতের দৃষ্টান্ত দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

আফগানিস্থান ও তার বাসিন্দা সম্বন্ধে আমাদের মনে অনেক উদ্ভট ধারণা আছে। আমাদের ধারণা আফগানিস্থান দেশটা যেমন কর্কশ ও পর্বতসংকুল, তেমনি তার অধিবাসীরাও বুঝি সব দয়ামায়াহীন অর্থলোভী এবং হিংস্র। কিন্তু বস্তুত তা নয়। আফগানিস্থান সম্বন্ধে এ প্রকার বিকৃত ধারণা পোষণ করার মত কোন হেতু আমি পাইনি।

আমার এই বই পড়ে আফগানিস্থানের যথার্থ স্বরূপ বুঝবার যদি সহায়তা হয় তবেই আমি কৃতার্থ মনে করব এবং আমার আফগানিস্থান ভ্রমণকেও সফল মনে করব।

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

ভূপর্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

(কাবুলে গৃহীত ফটো)

আফগানিস্থান

কাবুলের পথে

এক

আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমে ইরান এবং আফগানিস্থান। আফগানিস্থানের বাসিন্দাকে আমরা কাবুলি এবং ইরানের বাসিন্দাকে ইরানি বলি। কাবুলিরা আমাদের দেশে এসে মহাজনি কারবার করে এবং ইরানিরা বম্বেতে চায়ের দোকানের একচেটিয়া ব্যবসা করছে। আমরা কিন্তু ওদের দেশে অতি অল্পই গিয়ে থাকি। আমার ধারণা ছিল, ভারতের মুসলমান ভাইরা মুসলিম অধ্যুসিত দেশগুলিতে আসাযাওয়া করেন, কিন্তু আফগানিস্থান ইরান আরব সিরিয়া লাবানন এবং তুর্কি ভ্রমণ করে দেখলাম, আমার এ ধারণা ঠিক নয়। আমাদের দেশের লোক ওদের দেশে না যাবার সর্বপ্রথম কারণ হল পাসপোর্ট পেতে আমাদের খুবই বেগ পেতে হয়। দ্বিতীয় কারণ হল, আফগানিস্থান সম্বন্ধে অনেকগুলি ভীতিপ্রদ গল্প আমরা ছোটবেলা হতে শুনে এসেছি। আমরা সেই গল্পগুলিকে সত্য বলেই মনে করি, সে জন্যও অনেকে আফগানিস্থানে যেতে ইচ্ছা করে না। আমাকেও লাহোর রাওলপিণ্ডি এবং পেশোয়ারে সেরূপ গল্প শুনান হয়েছিল, কিন্তু আমি তাতে কান দিইনি। তারপর যখন আফগানিস্থানে গেলাম, তখন দেখলাম কাবুলিরাও আমাদের মতই মানুষ, এবং তাদের দেশ আমাদের দেশের মতই দেশ।

চীন জাপান কোরিয়া থাইল্যাণ্ড ইন্দোচীন এবং মালয় দেশ ভ্রমণ করে যখন কলকাতা এলাম তখন সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের আমার আফগানিস্থান হয়ে ইউরোপ যাবার ইচ্ছা আছে জানিয়েছিলাম। কখনও ভাবিনি এতে আমার কোন ক্ষতি হবে। কথাটা প্রচার হওয়া মাত্রই জনকতক অজ্ঞাতকুলশীল বন্ধু এসে আমার পাসপোর্ট দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি বিনাদ্বিধায় তাদের কৌতূহল পূর্ণ করেছিলাম। আমি পাসপোর্ট নিয়েছিলাম সিংগাপুর থেকে। পাসপোর্ট নেবার সময় ভুলবশত তাতে আফগানিস্থান শব্দটা লেখাইনি। যারা বন্ধু সেজে আমার পাসপোর্ট দেখেছিলেন তারা পাসপোর্টের ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই নীরব ছিলেন। এমন কি দিল্লির আফগান-কনসালও সেই ত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আফগানিস্থান যাবার ভিসা দিয়েছিলেন।

আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, যতদিন আমি আমার পর্যটন সমাপ্ত না করব ততদিন কোন বন্ধনে আবদ্ধ হব না। আমার আত্মীয়-স্বজনরা আমার একরোখা স্বভাবের কথা ভালভাবেই জানতেন, সেজন্যই তাঁরা আমাকে বিরক্ত করেন নি। কিন্তু মাটির টান অপরূপ। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়াবার সংগে সংগে আমার অজ্ঞাতসারেই চোখের জল গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। বুঝলাম জগতের সব ঠাঁই ঘর থাকলেও মানুষের সত্যিকার ঘর মাত্র একটিই, যে ঘর অক্টোপাশের মত মানুষের সমস্ত হৃদয়টাকে দৃঢ়বন্ধনে বেঁধে রেখেছে, সে ঘরটি মাতৃভূমি।

কলকাতা হতে পেশোয়ারের পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, শুধু গুজরাত শহরে একদিন সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হলে বুঝেছিলাম শরীরের দুর্বলতাই এই পতনের একমাত্র কারণ। রোড পুলিশ দয়া করে আমাকে উঠিয়ে পাশেই আর্যসমাজীদের একটা

মেয়েদের স্কুলে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয়, মাতৃজাতির একজনও এই হতভাগ্যের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হন নি। যাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতাকে নিন্দা করেন তাঁদের জানাচ্ছি, এমন দুর্ঘটনা যদি ইউরোপের কোথাও ঘটত তবে মায়ের জাতই সর্বপ্রথম আমার সাহায্যার্থ এগিয়ে আসতেন।

গুজরাতের ঘোল খেয়ে কএকদিনের মধ্যেই শক্ত হয়ে উঠলাম। এবার পেশোয়ারের দিকে রওনা হলাম এবং নির্বিঘ্নেই পেশোয়ার শহরে পৌঁছলাম। এখানে পা দেবার পরই কতকগুলি অতিরিক্ত-কৌতূহলী লোক আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে নানারূপ প্রশ্ন বর্ষণ করতে থাকে। ওদের হাত হতে নিজেকে বাঁচিয়ে নিকটস্থ একটা ধরমশালায় গিয়ে উঠলাম। ধরমশালার একটি রুম দখল করে একটা চারপাইএর ওপর শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।

বিকালে ধরমশালা হতে বের হতে যাব এমন সময় দাসগুপ্ত বলে এক যুবকের সংগে দেখা হল। পায়ে হেঁটে সে ভারত ভ্রমণ করছিল। উভয়ের মাঝে পরিচয় হবার পর আমাকে নিয়ে সে স্থানীয় কালীবাড়ির দিকে রওনা হল। কালীবাড়ি ধর্মস্থান বলে শুধু ধার্মিকরাই যে সেখানে যাওয়া আসা করে থাকেন, ধূর্ত পুলিশ কখনই তা মনে করে না। চোর ডাকাত ভিন্নও বিদেশি সরকারের চক্ষে আরেক শ্রেণীর অপরাধী, যারা দেশভক্ত বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত, তারাও যে কালীমাতার শরণাগত হন পুলিশ তা অবগত। তাই কালীর দুয়ারে পুলিশের যাতায়াত বিরল ছিল না। সেজন্য আমি দেবালয়ে আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হতাম, তা ছাড়া আমার মত দেবভক্তিহীনের পক্ষে দেবতার মন্দিরে আশ্রয় লওয়াটা আমি কাপুরুষতা বলেই মনে করতাম। তাই কালীমন্দিরে যেতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু দাসগুপ্ত মৃণ্ময় কালীমাতার ভারি ভক্ত। কালীবাড়িতে

পৌঁছামাত্রই ডিপ্লমেটিক পূজারি ঠাকুর ভিজে-বেড়ালটির মত আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কবে আফগানিস্থানে যাবেন? যেন তিনি আমাকে বেশ ভাল করেই চেনেন এবং আমি যে আফগানিস্থান যাব তাও তিনি কোথা হতে অবগত হয়েছেন।

লোকটার কথার কোন জবাব দিতেও আমার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বললাম, রওনা হলেই হল আর কি। কাছে বসা একটা মোটা লোক বললে, অনেকেই বলে আফগানিস্থান যাবে, কিন্তু কেউ যায় না, যাবার ক্ষমতাও রাখে না।

এদের কোন কথার জবাব না দিয়ে আমি দাসগুপ্তকে নিয়ে সোজা সিনেমা ঘরের দিকে চলে গেলাম। এসব প্রশ্ন বড় দুর্লক্ষণ বলে মনে হল। মনে বড়ই ভয় হচ্ছিল, বোধ হয় আমার অগ্রগতির পথে কোন বাধাবিঘ্ন জন্মেছে। চিন্তা করে ঠিক করলাম পরদিন সকালেই স্থানীয় আফগান কন্সালের সংগে সাক্ষাত করব এবং তাঁর কাছ হতেই জানতে পারব আমার পাসপোর্টে কোন দোষ আছে কি না।

পরদিন সকালেই আফগান কন্সালের বাড়ি গেলাম। কন্সাল অফিসের একজন যুবক-কেরানি আমার পাসপোর্ট দেখেই দয়ার্দ্রচিত্তে বললেন, আপনি আফগানিস্থানের দিকে রওয়ানা না হয়ে গিয়ে ভালই করেছেন। কি করে যে দিল্লির কন্সাল-জেনারেল ভিসা দিয়ে দিলেন তা মোটেই বুঝতে পারছি না। যা হোক, এখন আপনি এখানকার সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে পাসপোর্টে আফগানিস্থান শব্দটা লিখিয়ে নিয়ে আসুন, তবেই সকল গণ্ডগোল হতে রক্ষা পাবেন।

যুবকের কথামত সেক্রেটারিয়েটে গেলাম এবং একজন হিন্দু কেরানির সংগে সাক্ষাত করলাম। কেরানিটি বেশ আরাম করে বসে ছিলেন। আমাকে দেখামাত্রই তাঁর যেন মেজাজ বদলে গেল। মেয়েলি সুরে

জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই আপনার ? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি ? বলুন, বলুন, আমার যে মরবারও ফুরসত নেই। তার মুরুব্বিয়ানায় আমি একটু হেসে বললাম, এই আমার পাসপোর্ট, এতে আফগানিস্থান শব্দটা লিখিয়ে নিতে চাই।

আমার কথা শোনামাত্রই কেরানি চোখদুটা কপালে তুলে বললেন, এটা কি করে হয় ? এ কখনও হতে পারে না।

আমি বললাম, একটু বসতে চাই, আপত্তি নেই তো ?

কেরানি সামনের চেয়ারটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি বসলাম এবং চসমা খুলে নিজের হাতের রেখাগুলোর দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়ে রইলাম, যেন আমি হস্তরেখা বিদ্যায় খুব ওস্তাদ। কেরানিও বেশিক্ষণ আর স্থির থাকতে পারলেন না, আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হাতে কি দেখলেন ? আমি মাথা ঝাঁকিয়ে গাম্ভীর্যের ভান করে বললাম, দেখতে পাচ্ছি তিন দিনের মধ্যে আমি আফগানিস্থান পৌছব, তাতে আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমার কথা শুনে কেরানিও তাঁর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর নিজের ভাগ্যের কথা জানতে চাইলেন। তাঁর হাত দেখে অনুমানের উপর নির্ভর করে যা বলেছিলাম, যুবকটি তাতেই খুশী হয়েছিলেন।

আবার আমি তাঁকে আমার কাজের কথা পাড়লাম। এবার কেরানি অনেকটা সদয়চিত্তেই আমাকে পরদিন সকালে আসতে বললেন।

হিন্দু কেরানির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরবার পথে দেখা হল একটি মুসলমান কেরানির সংগে। তিনি ডেকে নিয়ে আমাকে তার কামরায় বসালেন এবং বললেন, যে কাজের জন্যে আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম, সে কাজটি তাঁরই কাজ, অন্য কারও নয়। এই বলেই তিনি বললেন, দিন তো পাসপোর্টটা, এখনই কাজটা সেরে দিচ্ছি। যুবক

আমার হাত থেকে পাসপোর্টটি নিয়ে তাতে আফগানিস্থান শব্দটা লিখে দিলেন। তারপর বললেন, পরদিন সকালে আমি যেন প্রাইভেট সেক্রেটারির সংগে দেখা করি। লোকটি বেশ ভাল, তাঁর দ্বারা আমার কিছু উপকারও হতে পারে।

পরদিন সকালে যুবকের কথামত প্রাইভেট সেক্রেটারির সংগে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাকে পর্যটক রূপেই গ্রহণ করলেন, আমিও তাঁকে একজন সদাশয় ইংলিশ ভদ্রলোক রূপেই নিয়ে শাসক-শাসিতের সম্পর্করহিত হয়ে অন্তরংগভাবে আলাপ করলাম। ইংলিশ যুবক আমাকে তাঁদের দেশে যেতে উৎসাহিত করলেন এবং বিশেষভাবে বলে দিলেন, ব্রিটেনে গিয়ে আমি যেন শিলিং হোস্টেল চেন-এর মেম্বর হই, সেখানে থেকেই ব্রিটেনের জনগণের সত্যিকার চেহারা দেখতে পাব।

দারিদ্র্য জিনিসটা পৃথিবীর সর্বত্রই একরূপ হলেও দারিদ্র্যের কারণ সর্বত্র এক নয়। ব্রিটেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সর্বদাই লড়াই ক'রে, প্রকৃতিকে আয়ত্তে এনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুঠ করবার চেষ্টা করছে। সে-লুঠের মোটা ভাগ পাচ্ছে যারা শক্তিমান, যারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং লুণ্ঠনে যাদের প্রকৃত যোগ সবচেয়ে কম। আর যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জয় করে আনলে, সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাগেই বখরা পড়ল সবচেয়ে কম। যন্ত্রসভ্যতায় যেসব দেশ বিশেষ পুষ্টিলাভ করেছে, সে সব দেশে দারিদ্র্য টাকাকড়ি কম বলেই নয়, বণ্টনের দোষে। আর আমাদের দেশের দারিদ্র্য যন্ত্রসভ্যতা বা বৈদেশিক শোষণের জন্যে তত নয়, যত আমাদের স্বভাবের দোষে। আমাদের দার্শনিকগণ দারিদ্র্যকে উচ্চ আসন দিয়েছেন। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থেকে উচ্চ চিন্তা করার শিক্ষা আমরা পেয়ে এসেছি। তাই আমাদের দেশে প্রকৃতি তাঁর সব সম্পদ উন্মুক্ত করে ধরে রাখা সত্বেও আমাদের দেশের লোক ক্ষুধায়

কাতর, দেনায় জর্জরিত, স্বাস্থ্যে বঞ্চিত এবং পরানুগ্রহে লাঞ্ছিত। কষ্ট করে এদেশের লোক কিছু অর্জন করতে পরাঙ্মুখ, ভিক্ষাস্বরূপ অন্নসন্ন পেলেই সন্তুষ্ট। এতে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা চলে, কিন্তু উচ্চ চিন্তা কখনই সম্ভব নয়। প্রভূত বাহ্যিক সম্পদ না হলে সভ্যতার সম্পদ কখনই আসবে না, দরিদ্র জাতি মনুষ্যত্ব হারিয়ে চরম ধ্বংসকে ডেকে আনে। আমরা ভারতবাসীরাও তাই করছি।

ইংলিশ যুবকটির কাছ থেকে বিদায় নিতে যখন উঠলাম, তখন তিনি সবিনয়ে আমার হাতে দশটি টাকা দিয়ে বললেন, পর্যটকের পাথেয়র জন্যে এ তাঁর যৎসামান্য সাহায্য, আমি গ্রহণ করে তাঁকে যেন কৃতার্থ করি।

এই ইংলিশ যুবকটির ভদ্র ব্যবহারে সেদিন আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রভুত্বের মোহে ইংরেজ-তনয়গণ এদেশে অন্ধ, তাদেরই একজন এত বড় উচ্চ পদের অধিকারী হয়েও আমার মত ধনমানহীন অধীনস্থ প্রজার প্রতি যে আচরণ করলেন, তা আশাতীত।

যা হোক, এবার আমি ভারতের সীমান্তের দিকে পা বাড়ালাম।

সীমান্তে একটা কাস্টম হাউস আছে। কাস্টম অফিসার একজন ভারতীয়। তিনি পাঠানদের পাসপোর্টগুলি একরূপ না দেখেই সিলমোহর করলেন। তাঁর কার্যকলাপ দেখে আমি তখন ভাবছিলাম, একটা গোলাম অন্য একটা গোলামকে স্বাধীন দেশে যেতে দেখতেও রাজি নয়, এজন্যই এরূপ করে আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। অফিসার যখন পাসপোর্ট পরীক্ষা করে সিলমোহর করলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, মনে অনেক আঘাত লেগেছে নিশ্চয়ই আমাকে আটকিয়ে রাখতে পারেন নি বলে? গোলাম প্রবৃত্তির এটাই বৈশিষ্ট্য। আপনি অথবা আমি যদি স্বাধীন জাতের লোক হতাম, তবে আমারই পাসপোর্ট

সিলমোহর পড়ত সর্বাগ্রে। অফিসারটি নীরবে অন্য কাজ করতে লাগলেন।

সীমান্ত পার হয়ে পার্বত্য উপত্যকার উপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলাম। উত্তুরে বাতাস এসে আমার নাকে মুখে ক্রমাগত আঘাত করছিল। আমার মন যেন আরও উত্তরে যাবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু আমাকে যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ ধরে। আরও দুমাইল যাবার পর এলাম আফগানি কাস্টম্ গৃহে। তথায় পাসপোর্টে শুধু সিলমোহর লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। আমি দক্ষিণ-পশ্চিমের মোটা পথটা ছেড়ে দিয়ে উত্তরের পথে অগ্রসর হলাম। আমার সামনে উলংগ উন্নত পর্বতমালা ঢেউ খেলে ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে আরও উত্তরে গিয়ে কালো মেঘের সাথে মিশেছে। আমি সে দৃশ্য একাকী দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে লাগলাম। মন আমার সে-দৃশ্য আরও দেখবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল, দক্ষিণ দিকে যেন যেতে মোটেই চায় না। উত্তরের ঢেউ-খেলান পর্বতমালা যেন আমায় দুহাত বাড়িয়ে ডাকছে, কিন্তু আমার গন্তব্যপথ আমায় টানছে দক্ষিণ-পশ্চিমের পথে।

একটা পাথরের উপর বসে ভাবতে লাগলাম, এই তো সেই আফগানিস্থান, আফগান জাতের বাসভূমি, যাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লোক কত ভ্রান্ত কাহিনী শুনে ভয়ে থর-থর করে কাঁপে। কিন্তু আমাকে তো এখনও কোন পাঠানই আক্রমণ করছে না। আমি একাকী, আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। তারপর হঠাৎ চিন্তাধারা বদলে গেল। মনে হল এটাতো বিদেশ নয়, এদেশ আমাদেরই। ঐ তো উত্তর দিক হতে হিমালয়ের শাখা হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকছে। ঐ তো কংকরময় সমতল ভূমি, দুম্বা-রক্ষকগণ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গোল গোল মুখ দেখলেই মনে হয় ককেশাস রক্ত তাদের শরীরে বইছে।

যদিও তাদের গায়ের পোস্তিল হতে একটা বিশ্রি গন্ধ বের হয়ে আসছে, তবুও তারা স্বাধীন। স্বাধীনতার গন্ধ যেন এক এক বার আমাকে আকাশের উঁচু চুড়ায় নিয়ে উঠাচ্ছিল, কিন্তু যখনই মনে হতে লাগল আমি বস্তুতপক্ষে পরাধীন দেশের লোক, তখনই কে যেন সশব্দে আমাকে আছড়ে ফেলে দিতে লাগল কঠিন মাটির ওপর। স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের পরাধীনতাকে বেশ ভাল করে হৃদয়ংগম করলাম। সামনে চেয়ে দেখলাম একটা অন্ধকার আবরণ যেন ভারত মাতার মহিমময় মূর্তিকে ঢেকে রেখেছে, আর আমার হাত সেদিকে আপনি চলে যাচ্ছে সেই দুর্গন্ধময় অন্ধকার আচ্ছাদনটাকে সরিয়ে ফেলতে। স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল আমার কোন অধিকার নেই স্বাধীন দেশে থাকতে। আমার গায়ের বাতাসও যেন স্বাধীন দেশের বাতাসকে কলুষিত করে তুলবে। তাই নিজের দিকে তাকিয়ে মনের ভেতর থেকে আর্তস্বরে একই কামনা বার বার বেরিয়ে আসছিল—স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!

দুই

কতক্ষণ চলার পরই একটি ছোট গ্রাম পেলাম। গ্রামে গোলাবাড়ি নেই। গ্রামের একমাত্র দোকান অর্ধেকটা বন্ধ অর্ধেকটা খোলা। যে অংশে বেনের দোকানের জিনিস বিক্রি হয় সে অংশটাই শুধু খোলা, অন্য অংশটা বন্ধ। উঁকি মেরে দেখলাম অন্য অংশটাতে গোস্ত-রুটি বিক্রি হয়। খিদে বেশ ছিল, তাই দোকানদারকে বললাম গোস্ত-রুটি দেবার জন্যে। দোকানদার বললে, রোজার মাসে সে খাদ্য বিক্রি করবে না। আমি বললাম, তুমি না হয় উপোস করে স্বর্গে যাবে, আমি স্বর্গে যেতে চাইনে, বেঁচে থাকতে চাই। তারপর আমি মুসলমান ধর্মের

লোকও নই, আমার কাছে খাদ্য বিক্রি করতে কি আপত্তি থাকতে পারে? উপরন্তু আমি খিদেয় কাতর। দোকানদার বললে, যদি নিজের হাতে খাবার নিয়ে খাই তবে বিক্রি করতে তার কোন আপত্তি নেই। আমি তাতে রাজি হলাম।

একটা ডালাতে কতকগুলো পাঠান-রুটি এক টুকরা ময়লা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। রুটিগুলি চাপাতি হতে চারগুণ বড় এবং পাঁচগুণ পাতলা। রুটি হতে বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ বের হয়ে আসছিল। দুখানা রুটি বের করে নিয়ে, ডালাটিকে পূর্বের মত ঢেকে রেখে নিকটস্থ একটা হাঁড়িতে হাত দেওয়া মাত্র দোকানি চিৎকার করে উঠল। বললে, এটাতে যে-মাংস আছে তা তুমি খেতে পার না, দাঁড়াও আমি গরম জল নিয়ে আসছি। বুঝলাম তাতে গোমাংস ছিল। গরম জল এনে দেবার পর অন্য হাঁড়ি হতে দু টুকরা মুরগির মাংস বের করে নিলাম। এসব হোটেলে মুরগিটাকে মাত্র চার টুকরা করেই পাক করা হয়। দু টুকরা মুরগির মাংস এবং দুখানা পাঠান-রুটি অনায়াসে খেয়ে ফেললাম।

ভোজনের তৃপ্তি মুখেই ফুটে ওঠে। আমার মুখাবয়বে সেই তৃপ্তির ভাব ফুটে ওঠায় পাঠানেরও তৃপ্তি হয়েছিল। ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বেড়িয়েছি, অনুভব করেছি ভোজন করিয়ে তৃপ্ত হওয়াটা অনেকেই চায়। বর্তমানে অভাবের তাড়নায় এই ভাবটি লোপ পেতে বসেছে। পাঠান যদিও পয়সা নিয়েই আমার কাছে খাদ্য বিক্রয় করেছিল, তবুও তার মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটে উঠতে দেখে স্বভাবতই ভারতীয় কৃষ্টির কথা মনে পড়ল। বিদায় নেবার বেলা মাথায় টুপি রেখেই তাকে আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। পাঠানও আমাকে নমস্কার বলে হাত জোড় করতে ভুলেনি।

দোকান থেকে বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। মাইল পাঁচেক

যাবার পর দূর থেকে একটি টিলার উপর কএকটি বাংলো ধরনের বাড়ি দেখতে পেলাম। এদিকে পথ যদিও প্রশস্ত এবং সমতল, তবুও অযত্নের দরুন বড় বড় পাথর পথকে দুর্গম করে রেখেছে। খুব কষ্টে সাইকেল ঠেলে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় একজন সেপাই এসে আমাকে বাংলোয় যাবার জন্য ইংগিত করলে। আমি বিনাবাক্যব্যয়ে তার অনুসরণ করলাম। বাংলোতে যাবার পর একজন অফিসার পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে আমার সংগে কথা বলতে লাগলেন।

অফিসারটি অনেকদিন হংকং-এ ছিলেন। তাঁর পোশাক দেখেই অনুমান করেছিলাম তিনি একজন বড়দরের অফিসার হবেন। আমার ধারণা যে ঠিক তা তাঁর সংগে কথাবার্তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। আফগানিস্থানে যাদের সংগে পরিচিত হয়েছিলাম তাদের অধিকাংশই ভগবানের নামে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। কিন্তু এই অফিসারটি আমাকে জানালেন শুভেচ্ছা।

কাবুল কান্দাহার গজনি ইত্যাদি ভ্রমণ করে আফগানিস্থানের সৈনিক বিভাগের অনেক কথাই পরে জেনেছিলাম। আফগানিস্থানে নানা শ্রেণীর লোকের বাস। কতকগুলি সম্প্রদায় মিলে আফগান জাতের গড়ন হয়েছে। সমস্ত সম্প্রদায়ই একই ধর্মের অন্তর্গত নয়, একেক সম্প্রদায়ে আবার বিভিন্ন ধর্মও আছে। যেমন হিলজাই সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। ওরা যখন স্বগ্রামে বসবাস করে তখন নিজেদের সুবিধার্থে হিন্দু এবং মুসলমান বলে পরিচিত হয়, কিন্তু বিদেশে গেলে সবাই পাঠান বলেই নিজেদের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশে যত কাবুলিওয়ালা দেখতে পাই তাদের মধ্যে অনেক হিন্দু আছে, আমরা তাদের চিনতে পারি না। আমাদের কাছে এরা সবাই পাঠান ও মুসলমান।

লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই দেশরক্ষার্থে সেপাই সরবরাহ করতে হয়। সম্প্রদায়ে কত হিন্দু কত মুসলমান আছে তার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আফগান সরকার ভাল করেই অবগত আছেন কোন্ সম্প্রদায়ে কত লোকসংখ্যা। তাঁরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মণ্ডলকে জানিয়ে দেন যে তাকে এত সেপাই দিতে হবে। মণ্ডল আদেশ পাওয়া মাত্র নির্ধারিত প্রথামতে সেপাই সরবরাহ করেন। এতে সম্প্রদায়ের হিন্দুরা বাদ পড়ে না। হিন্দুরা সাধারণত সেপাইএর কাজ করে না, তারা নিজের সম্প্রদায় হতেই ভাড়া করে লোক পাঠায়। এরূপ ভাড়াটে সেপাই সরকার হতে প্রাপ্য মাইনে তো পায়ই, উপরন্তু যে তাকে ভাড়া করে পাঠায় সেও মাইনে দেয়। এই ভাড়াটে সেপাইদের সংগে অন্য যে-কোন পরাধীন দেশের সেপাইএর সংগে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যারা ভাড়াটে নয় তারা নিঃশংক চিত্তে আপন আপন কাজ করে যাচ্ছে। অফিসারদের সামনেই তারা সিগারেট ফুঁকছে, হাসি ঠাট্টা করছে। কিন্তু ভাড়াটে সেপাইরা সকল সময়ই সন্ত্রস্ত, এদের অফিসারগণও যেন এদের এই আড়ষ্টতা পছন্দ করেন না। ব্যারাক হতে এই অভিজ্ঞতাটি অর্জন করে ফের পথে এলাম।

ব্যারাকটি হল একটি ঘাঁটি। যে কেউ আফগানিস্থানে যাক, প্রত্যেককেই এখানে গিয়ে প্রশ্নের জবাব দিয়ে আসতে হয়। আমাকে কোন প্রশ্ন করা হয়নি দেখে মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়েছিল। পর্যটকের বেশ আদর আছে বলে মনে হল। পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানে ভারতের লোক অতি অল্পই যায়। অফিসারের সংগে কথা বলে জেনেছিলাম, আমার আফগানিস্থান প্রবেশ করার পূর্বে তিনজন পারসি যুবক সাইকেলে কএক মাস পূর্বে এসেছিলেন এবং তার ছয়

বৎসর পূর্বে একজন বাংগালি বৈষ্ণব একতারা হাতে করে, হরি নাম গাইতে গাইতে কাবুল গিয়েছিলেন। গত ছয় বৎসরের হিসাব মতে আফগানিস্থানে পর্যটক হিসাবে আমি হলাম পঞ্চম ব্যক্তি। আফগানিস্থানে পর্যটকের স্থান সাধারণ লোক হতে অনেক উঁচে, এই বিষয়টি পরে জেনেছিলাম।

তিন

আমার সাইকেল চলছে। আমার পায়ে শক্তি আছে। নতুন দেশের নতুন গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে পথ চলছি। আফগান জাতের কথা, তাদের দেশের আবহাওয়ার কথা একটার পর একটা মনে আসছিল। ভয়ানক অনুতাপ হচ্ছিল আফগানিস্থান সম্বন্ধে নানা বিকৃত এবং কল্পনাপ্রসূত কাহিনী এককালে বিশ্বাস করেছিলাম বলে। আফগানিস্থানে এসে দেখছি এসব মিথ্যা গাঁজাখুরি। কোথায় ডাকাত আর কোথায় হিন্দু-বিদ্বেষ, কেউ তো এখনও এল না আমাকে কল্‌মা পড়িয়ে মুসলমান করতে। মনে মনে মিথ্যা-রটনাকারীদের কঠোর ভৎ´সনা করে সাইকেল চালিয়ে যেতে লাগলাম। দুএক খানা পর্ণকুটির পথের পাশে দেখতে পেলাম। আমি কুটিরগুলির কাছে গিয়েছি, কুটিরবাসীদের সাথে কথা বলবার চেষ্টা করেছি ওদের মনোভাব জানবার জন্যে। কিন্তু কই কেউ তো আমাকে হত্যা করলে না। অনেকের বাড়িতেই ছোরা এবং ছোট বন্দুক ছিল, কিন্তু কেউ তো আমাকে তা দিয়ে আক্রমণ করেনি।

আমাদের দেশে যেমন করে সূর্য অস্ত যায়, ওদের দেশেও তেমনিই সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আমি ডাক্কা নামক ছোট একটি গ্রামের কাছে পৌঁছলাম। দূর হতে গ্রামের প্রকৃত চেহারা মালুম হল না। গ্রামে

শ্রী নেই বলেই মনে হচ্ছিল। গ্রামে প্রবেশ করে বুঝলাম সত্যই গ্রামের শ্রী নেই।

রাত্রে থাকার জন্য গ্রামের প্রায় সমুদয়টাই ঘুরলাম। শেষটায় যখন কোথাও স্থান পেলুম না তখন কুমিদানের অফিসে গেলাম। আমাদের দেশে যেমন পাঁচ সাতটা গ্রাম নিয়ে একটা পুলিশ স্টেসন থাকে, আফগানিস্থানে কিন্তু তা নয়। এখানে প্রত্যেক গ্রামেই একজন করে দারোগা আছেন। দারোগাকে কুমিদান বলে। ডাক্তার কুমিদান একজন যুবক। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন দেশ-বিদেশের সংবাদ অবগত হবার জন্যে নানারূপ প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে আমার অভিজ্ঞতা বলার পর বিনয়ের সাথে জানালাম, আমি এখানকার হিন্দুদের অবস্থা জানতে চাই, যদি দয়া করে সে-বিষয়ে তিনি সাহায্য করেন তবে বাধিত হব। আমার প্রস্তাব শুনে কুমিদান খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে মনে হল না।

যা হোক, তিনি একজন লোক আমার সংগে দিয়ে হিন্দুদের বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিলেন। রাত্রের অন্ধকারে কএকটি হিন্দু বাড়িতে গিয়ে দেখলাম এরা মরার মত দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। এদের মাঝে রক্তমাংস আছে বলে মনে হল না। প্রত্যেকের শরীর রুগ্ন এবং প্রত্যেককে দেখলেই মনে হয় আয়েসী। ওরা আমাকে একটুও আপনজন ভাবলে না। তারা হয়তো এই ভেবে শংকিত হচ্ছিল যে আমি তাদের বাড়িতে রাত্র থাকার জন্যই হয়তো গিয়েছি। এদের হীনভাব দেখে বেশিক্ষণ এদের বাড়িতে থাকলাম না। কুমিদানের বাড়ি ফিরে এলাম।

ফিরে এসে কুমিদানের মুখ ভার দেখলাম। এখানকার হিন্দুরা মুসলমান বাড়িতে খায় না, সেজন্য কুমিদান আমার খাবারের জন্য

ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। কুমিদান সুন্নি মুসলমান। আমার খাবারের জন্য তাঁকে চিন্তান্বিত দেখে বললাম, মহাশয়, আমি হিন্দুদের বাড়িতে গিয়েছি বলে হয়তো ভেবেছেন আমি ওদের মতই মনোবৃত্তি পোষণ করি। তা আপনার ভুল। আমি গিয়েছিলাম, এখানকার হিন্দুরা কেমন করে নির্বংশ হচ্ছে তা দেখতে। যদি দেশে গিয়ে বলতে পারি, পুরাতন আচার-পদ্ধতি বজায় রাখলে কি করে একটা জাত ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে যায়, তবে হয়তো তাতে হিন্দুস্থানের হিন্দুদের কোন উপকার হতে পারে। এই হতভাগ্যরা টাকার কুমির, অথচ কৃপণ। ওরা নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্যও টাকা খরচ করে না, টাকা খরচ করে স্বর্গে যাবার জন্যে। এদের মুখে হাসি নেই, এরা অতিথি দেখলে ভয় পায়। এদের এই অবস্থা মরবার পূর্বলক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়।

খাবারের বন্দোবস্ত হল। খেতে বসলাম। ভাত, দুম্বার মাংস এবং কাঁচা পেঁয়াজ। ভাতে ঘি দেওয়া ছিল না। হিন্দুরা চাউলে ঘি মাখিয়ে পাক করে, এতে অগ্নিমান্দ্য হয়। কিন্তু সাদা ভাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়। খেতে বসে মাংস এবং ভাত কুমিদানের চেয়েও দ্বিগুণ খেতে সক্ষম হয়েছিলাম। যদি কুমিদান আমার শক্তির পরিচয় চাইতেন তবে তাঁকে যে-কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করতে আমাকে বেগ পেতে হত না।

আমার মনে একটা আগুন জ্বলছিল। সেই আগুন হল, আফগান জাতকে নিষ্ঠুর নরঘাতী বলে যারা চিত্রিত করেছে তাদের প্রতি ঘৃণা। আহারের পর কুমিদানকে আফগানিস্থান সম্বন্ধীয় সেই সব মিথ্যা রটনাগুলি সম্বন্ধে বলেছিলাম। তিনি হাসেন নি, দুঃখ করে বলেছিলেন, এ তো সামান্য কথা। পৃথিবীতে কত হীন মিথ্যাবাদীই আছে যারা তিলকে তাল করে লোকসমাজে প্রচার করে।

পরদিন সামান্য সময়ই গ্রামে ছিলাম। এই সময়টুকুতেই বুঝতে পেরেছিলাম, গ্রামের মরণমুখী হিন্দুদের সুখী করার জন্য গ্রামের ভেতর কোন মুসলমান গোহত্যা করে না। গোহত্যা হয় গ্রামের বাইরে বহুদূরে। কাটা মাংস গ্রামে গোপনে আসে, এবং গোপনেই বিক্রি হয়ে থাকে। আফগানরা উদারচিত্তে এই মরণ-মুখী হিন্দুদের মনস্তুষ্টি করে থাকে। অথচ আজ যে হিন্দু যুবতী গোমাংস দেখে বমি করে, কদিন পর যখন তার বৃদ্ধ স্বামী মারা যায় তখন সেই যুবতীই গ্রামের কোন মুসলমান যুবকের সংগে চলে যায়, এবং সেই ঘৃণিত গোমাংস অম্লান বদনে পাক করে নিজেও খায় এবং অপরকেও ভোজন করায়। উদারতার গুণে কেহ নিজেদের উন্নত ও পুষ্ট করছে, পক্ষান্তরে ঐ গুণটির অভাবে কেহ নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে।

ডাক্কা গ্রাম পরিত্যাগ করার পূর্বে স্থানীয় বাড়িঘরের দিকে একটু লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম, অনেক বাড়ির দেওয়ালে বন্দুকের গুলি দেবে গিয়ে যে ছিদ্র হয়েছিল তা এখনও বন্ধ করা হয়নি। ভবিষ্যত বংশধরদের দেখাবার জন্যই হয়তো গুলিবিদ্ধ দেওয়ালগুলি যেমন আছে তেমনি অবস্থায়ই রাখা হয়েছে। এরূপ কএকটি ঘর দেখার পর আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কারণ এই ছিদ্রগুলি করেছে ভারতীয় সেপাই। ভারতীয় সেপাই-এর বিরুদ্ধে পাঠানদের একটা বিদ্বেষ চিরদিন জাগরূক থাকবে, এটা নিশ্চিত কথা। এ দৃশ্য আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম না, আমার গন্তব্যপথে রওয়ানা হয়ে পড়লাম।

গ্রাম পার হয়েই বড় রাস্তায় পড়লাম। রাস্তা প্রশস্থ। পথের একদিকে ঢালু সমতল ভূমি, অন্যদিকে দূরে আঁধার পর্বতমালা।

আমি দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম। মনে হল পর্বত বৃক্ষ-রাজিতে পূর্ণ বলেই হয়তো ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার ধারণা সত্য নয়। এদিকের পর্বতে বৃক্ষের বড়ই অভাব। পর্বতের নিজেরই ছায়া পড়ে পর্বতকে অন্ধকার দেখাচ্ছে।

পর্যটকের চলার পথে একটা বড় বাধা এই সব প্রাকৃতিক দৃশ্য। পথের দুধারে প্রকৃতি অপরূপ ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে রয়েছে, নাগরিক সভ্যতার ইঞ্জিনিয়রদের যন্ত্রস্পর্শ থেকে দূরে থেকে প্রকৃতি নিজেকে অক্ষত রেখেছে। আমার মত অকবিকেও পথের সৌন্দর্য মন্ত্রমুগ্ধ করে চলার কথা ভুলিয়ে দেয়।

সৌন্দর্যের মায়াপুরী হতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার চললাম কঠিন পথের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে। পথ দুর্গম। পথ দুর্গম বলে কি পথ চলা বন্ধ করতে পারা যায়? নতুনের সন্ধানে নতুন শক্তি আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

সাত মাইল যাবার পর একটা ছোট গ্রাম পেলাম। গ্রামে লোকজনের বসতি কম। গ্রামখানা উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত। পথের দুপাশে ঘরগুলির অবস্থান। এখানে গৃহনির্মাণ পদ্ধতি আমাদের দেশের ধরনে নয়। আমাদের দেশে ঘরগুলি যেন ক্রমেই পথকে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করে আর ওদের ঘরগুলি যেন ক্রমেই সরে সরে পথকে পথ করে দিচ্ছে।

চার

গ্রামে বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না, কারণ আমাকে আরও এগিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে জালালাবাদ পৌঁছতেই হবে। সেখানেই রাত্রিবাস

করব। সেজন্য গ্রামটার ভেতর প্রবেশ করে অল্পক্ষণমাত্র ঘোরাফেরা করে দেখলাম। গ্রামে লোকজন নেই। পরে শুনেছিলাম এই গ্রামে শিয়া শ্রেণীর লোক বাস করে। আফগানিস্থানের শিয়ারা অন্য জাতের লোক। ওরা জাতে মোংগল। ভাষাও ওদের পৃথক। এরা আলু চাষ করতে বেশ পটু। তখন নাকি আলু উঠিয়ে আনার সময় ছিল, সেজন্যই পরিবারকে পরিবার আলুর ক্ষেতে চলে গিয়েছিল।

এদের ঘরতৈরির পদ্ধতি পাঠানদের মত নয়। এখনও এরা আদিম মোংগল জাতির মতই ঘর তৈরি করে। আদিম মোংগল ধরনের ঘর ভারতের বাইরে সর্বত্রই দেখা যায়। ভারতের মাঝে এখনও বাংলা আসাম এবং উড়িষ্যাতে মোংগল পদ্ধতির ঘর বিরল নয়। পুরীতে যারা আদিম যুগের তিন মূর্তি মন্দির দেখতে যান তাঁরা যদি দয়া করে পূজারীদের ঘরের দিকে তাকান তবেই বুঝতে পারবেন মোংগল ধরনের ঘর কি রকমের হয়। ভারতের মোগল বাদশারা মোংগল ছিলেন। খাস মোংগলদের বাড়িতে এসে মনে হল এদেরই পূর্বপুরুষ একদিন আফগানিস্থান হতে বংগদেশ পর্যন্ত জয় করে রাজত্ব করেছিলেন।

গ্রাম পরিত্যাগ করে পথে এলাম। পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চলল। বিকালের দিকে একখানা মধ্যম গোছের গ্রামে এলাম। এসব গ্রামে থাকবার কোন কষ্ট নেই। থাকবার কষ্ট যে কি আমাদের বাংলা দেশের লোক অনেক সময় হয়তো বুঝতেও পারে না। এ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার মনে করি। রাত্রি বেলা আফগানিস্থানের পার্বত্য অঞ্চলে ভয়ানক শীত পড়ে থাকে। শীতের সময় বাইরে থাকা অসম্ভব। গরমের সময় কোনরূপে রাত্রে বাইরে থাকা যায়। গ্রামে মুসাফিরখানা দেখতে পেলাম না, সেজন্যই রাত কাটাবার জন্য মসজিদেই আসতে বাধ্য হলাম। যে লোকটি মসজিদে আজান দেন

তাঁরই সংগে আমার সর্বপ্রথম আলাপ হল। তিনি আমাকে আমার বাড়ি কোথায় এবং আমি কোন্ ধর্মের লোক জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটিকে দেখে মনে হল তিনি চঞ্চল এবং উগ্র প্রকৃতির নন। আমি তাঁকে বললাম, এইমাত্র জেনে রাখুন আমি মুসলমান ধর্মের লোক নই। আমার কথা শুনে মোল্লা আমাকে মসজিদের এক কোণে একটা লম্বা তাকিয়া, একটা ছোট তোশক এবং সন্দল সমেত একটা লেপ এনে দিলেন। তারপর বাইরে রেস্তোঁরায় গিয়ে খেয়ে আসতে বললেন। আমি তাঁর নির্দেশ মত রেস্তোঁরায় গিয়ে খেয়ে এসে মসজিদে বসলাম, এবং আরাম করে একটা সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম। মসজিদে বসে সিগারেট খাওয়া অন্যায় কাজ একথাটা জেনেশুনেও আমি অন্যায় কাজে ব্রতী হলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। আমি যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত এমন সময় মোল্লা এসে আমায় ডেকে জাগালেন। বললেন, এখন আর রাত নেই, আজান করা হবে। আপনি হয়তো ঘুমের মাঝে হঠাৎ ভয় খেয়ে যাবেন সেজন্যই ডেকে দিলাম।

কাঁচা ঘুম ভেংগে যাবার পর ঘুম সহজে আর ফিরে আসেনি। বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি নানা কথা ভাবতে লাগলাম। হিন্দুস্থানের মুসলমানদের মতে আমি কাফের, আমাকে কলমা পড়িয়ে ইসলাম ধর্মে আনা তাদের পক্ষে একটা বিশেষ পুণ্যের কাজ। কিন্তু এখানে দেখছি তার বিপরীত। এখানে লোকের সাধারণ বুদ্ধি আছে বলেই মোল্লা আমাকে ডেকে উঠিয়েছিলেন। সাধারণ বুদ্ধি সহজে আসে না। সাধারণ বুদ্ধি আসে ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে। যে দেশ এবং যে জাত স্বাধীন, তাদের জীবন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝ দিয়েই কাটে।

আমি পূর্বদিকে মাথা রেখে শুয়েছিলাম। মোল্লা সেজন্য প্রতিবাদ করেন নি। এমন কি সে দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করেনি। পরদিন

প্রাতে বিদায়ের বেলা মোল্লা আমাকে বললেন, আপনার অনেক অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয়ই, সেজন্য ক্ষমা করবেন। দুঃখের বিষয় আমাদের গ্রামে মুসাফিরখানা নেই।

মোল্লাকে আতিথ্যের জন্য ও আশাতীত ঔদার্যের জন্য দুচার কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম। বেশি কথা বলবার আমার সময় ছিল না। আমি তখন স্বদেশের কথা চিন্তা করছিলাম। ভাবছিলাম স্বাধীনতার কত গুণ। পরাধীন ভারতের জাতিভেদ আমার হৃদয়ে ধাক্কা দিচ্ছিল। পরাধীন ভারতের মুসলমানরা বর্ণহিন্দুদের গোঁড়ামি বেশ ভাল করেই শিখেছে। তারা স্বাধীন মুসলমান দেশগুলির পদাংক অনুসরণ করবে দূরের কথা, নিজেদের সত্তা ভুলে গিয়ে নিজেদের ডুবাবার জন্যে বিপরীত দিকেই এগিয়ে চলেছে।

আজ যদি এটা আফগানিস্থানের মসজিদ না হয়ে ভারতের কোন মন্দির অথবা মসজিদ হত তবে আমাকে এই শীতের রাতে বাইরে শুয়ে নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হতে হত। কারণ মন্দিরের গোঁড়া পুরোহিত এবং মসজিদের মোল্লা কেউই আমার বিরুদ্ধ আচরণকে উদারতার সংগে উপেক্ষা করে যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এসব কথা যতই ভাবতে লাগলাম ততই আমাকে কালাপাহাড়ী ভাবে পেয়ে বসতে লাগল। কিন্তু কালাপাহাড়ী যুগ চলে গিয়েছে। নতুন যুগের নতুন চিন্তাপদ্ধতির সাথে তাল রেখে নতুন ভাবে আমাদের চলতে হবে। মন্দির মসজিদের ইট পাথরকে না ভেংগেও ধর্মগত সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার উচ্ছেদ করে মন্দির মসজিদকে আমরা বৃহত্তর মানবতার পরিধিতে নিয়ে আসতে পারি। তা যদি না করতে পারি তবে জাতি হিসেবে আমরাও একদিন মন্দির মসজিদের ভংগুর ইট পাথরের মতই জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ভূগর্ভে সমাধি লাভ করব।

এমনি ধরনের চিন্তা করে যখন পথ চলছি, হঠাৎ কোথা হতে একটা বুলডগ এসে আমাকে আক্রমণ করলে। আমি বুলডগ-চরিত্র জানতাম, সেজন্যই সাইকেল হতে নেমে পড়লাম। বুলডগের আক্রমণ এবং নেকড়ে বাঘের আক্রমণ একই রকমের। আমাকে সাইকেল হতে নেমে দাঁড়াতে দেখে বুলডগটা একটু থমকে দাঁড়াল এবং পরে কাছে এসে আমার গা শুঁকতে লাগল, কিন্তু কামড়াল না। আফগানি বুলডগের একটা সহজ বুদ্ধি আছে। চোর-ডাকাতকে ওরা চেনে এবং তাদের আটকিয়ে রাখে এবং কামড়ায়ও। তবে আফাগানিস্থানে বুলডগের সংখ্যা খুবই কম। শীতের সময় যখন সাইবেরিয়া হতে নেকড়ে বাঘের দল আফাগানিস্থানে অভিযান চালায় তখন অনেকেই তাদের বুলডগকে ঘরের মাঝে বেঁধে রাখে। অনেকে আবার ছেড়েও দেয়। যারা ছেড়ে দেয় তাদের বুলডগ ক্বচিৎ ফিরে আসে। নেকড়ের দল তাদের খেয়ে ফেলে। তবে যদি কোন একটি ফিরে আসে, তবে শুধু-হাতেই ফিরে আসে না, নিহত একটি নেকড়েকেও যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপ মুখে করে নিয়ে আসে।

বুলডগের সামনে আমি যখন পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন একজন লোক সম্ভবত আমাকে বিপন্ন ভেবেই বুলডগটার দিকে তেড়ে এলেন। কাছে এসে বুলডগটাকে তিনি এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে কুকুরটা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটি প্রৌঢ়, জাতে খিলজাই। তাঁর দেহ দীর্ঘ, বুকটা উঁচু, মাথায় লম্বা চুল, দাড়ি কামানো। বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানিতে তিনি বললেন, এ ভাবেই বুলডগের হাত হতে বাঁচতে হয়। আপনি কে এবং যাবেন কোথায়? আমি বললাম, আমি একজন বাংগালী, বেরিয়েছি পৃথিবী ভ্রমণ করতে।

আফগানিস্থানকে সকল সময়ই আমি ভারতেরই একটি অংশ বলে

মনে করেছি, সেজন্যই আফগানিস্থানে ইণ্ডিয়ান অথবা অন্য কোন প্রচলিত শব্দে নিজের পরিচয় দেইনি। আফগানিস্থানে উর্দু ভাষার প্রচলন শুধু হিন্দুদের মাঝেই আবদ্ধ, কিন্তু অন্যান্যরা হিন্দুস্থানিই জানে এবং উর্দু মোটেই পছন্দ করে না। নমুনা স্বরূপ দু একটি কথা বলতে পারি। মুসলমানরা বলে—তোমারা নাম ক্যা হায়? তুম কিদার যাওগে? তোমারা কাম বন্ যায়েগা। হিন্দুরা বলে, ইস্‌মে সরীফ? আপকা দৌলতখানা? আপ কামইয়াব হো যাওগে। আফগানিস্থানে হিন্দুস্থানি এবং উর্দুর ধাক্কা ভারত হতে যায়নি, ইরান হতে এসেছে। ইরান এবং আফগানিস্থানের মাঝে সীমানা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল, সেজন্যই পাঠানরা আর ইরানি শব্দ ব্যবহার করতে পছন্দ করে না, তারা চায় পোস্ত শব্দ ব্যবহার করতে। দুঃখের বিষয়, ইরানে গিয়ে দেখলাম ইরানি ভাষা হতে আরবি শব্দের ব্যবহার পরিত্যাগ শুরু হয়েছে। ফলে ইরানে আফগানিস্থানে ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, জার্মান এবং পুরাতন ভাষা যাকে আমরা সংস্কৃত বলি তার ব্যবহার শুরু হয়েছে।

পাঠানের হিন্দুস্থানি ভাষার পারিপাট্য দেখে হাসি পেয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, কারণ এই ভাষাই ভারতের সর্বত্র চলে। এই ভাষাকেই বোধ হয় জওহরলাল হিন্দুস্থানি বলেছিলেন। আফগানিস্থান হতে শুরু করে ব্রহ্ম দেশের পূব পর্যন্ত যার প্রচলন তাকে হিন্দি বল, উর্দু বল, আর হিন্দুস্থানিই বল, একে ডান দিক হতে লিখতে আরম্ভ কর আর বাঁদিক হতেই শুরু করে ডানদিকে শেষ কর, তাতে এই ভাষাটির কিছুই আসে যায় না, কারণ এই ভাষা ভারতের ও ব্রহ্মদেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক ব্যবহার করতে পারে। এই ভাষাই হবে ভারতের মেণ্ডারিন। ক্রমে হয়তো আমরা আতাতুরুকের পদাংক অনুসরণ করে এই ভাষাকে লেতিনি অক্ষরে লিখব এবং পড়ব।

আমার উদ্ধারকর্তা পাঠান খিলজাই সম্প্রদায়ের। খিলজাইরা বড়ই অতিথিপরায়ণ, কিন্তু আমি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে প্রথমত রাজি হইনি। তাঁকে বললাম, আজই জালালাবাদে পৌছান আমার দরকার। পাঠান হেসে বললেন, আজ কেন আগামী কল্যও আপনার জালালাবাদে পৌছা সহজ হবে না, অতএব চলুন আমার বাড়িতেই।

আমার কাছে আফগানিস্থানের ছোট একখানা মানচিত্র ছিল। তা দেখে বুঝতে পারিনি জালালাবাদ কত দূর, তাই অগত্যা পাঠানের বাড়ি অতিথি হলাম। পাঠানের বাড়ি নিকটস্থ একটা পাহাড়ের গায়ে। তাঁর বাড়ি গিয়ে পৌছতে আমার গা দিয়ে যথেষ্ট ঘাম নির্গত হয়েছিল। পাঠান ধনী নয়, তবে অসচ্ছলও নয়। তার ফলের বাগান ও ঘাসের জমি পরিমাণে বেশি না হলেও একেবারে কম নয় বলেই মনে হল। পাঠান বিবাহিত। বাড়িতে আর একটি যুবককে দেখে ভেবেছিলাম এই লোকটি হয়তো গৃহস্বামীর ছোট ভাই হবে, কিন্তু সেই লোকটি একজন জায়গীরদার মাত্র। জায়গীরদার মানে হল, যে শুধু খায়, থাকে এবং বাড়ির কাজ কর্ম দেখাশোনা করে। আফগানিস্থানে জায়গীরদার হওয়া সম্মানের বিষয় নয়, সকল সময়ই মাথা নত করে থাকতে হয়। এজন্যই বোধ হয় তথায় পারতপক্ষে কেহ জায়গীরদার হতে রাজি হয় না। জায়গীরদার পৃথক একটা কামরায় থাকে। অতিথিসজ্জন এলে জায়গীরদার নিজের ঘর ছেড়ে চলে যায় না, তার ঘরেই অতিথির থাকবার বন্দোবস্ত হয় এবং সে অতিথির আদর যত্ন করে।

আমার যাবার আধ ঘণ্টা পরই জায়গীরদার হাতমুখ ধোবার জল এনে দিল, খাবারের যায়গা করল একখানা ভাল কারপেটের ওপর একখানা সাদা চাদর বিছিয়ে। তারপর ভিতরবাড়ি হতে সে যা নিয়ে এল তা দেখে আমার জিহ্বা হতে জল বোধহয় সহস্র ধারায়

বের হচ্ছিল। কি সুন্দর মোলায়েম ভাত আর তার পাশেই বড় বড় করে কাটা দুম্বার কাবাব। পাঠান বাইরে ছিলেন, তিনি এসেই হাত ভাল করে ধুলেন। হাত ভাল করে ধোওয়া হয় মাটির সাহায্যে। এখনও আফগানিস্থানে পশ্চিমি আভিজাত্য আসেনি, এখনও আফগান জাত প্রকৃতির অনুগত, সে জন্যই মাটির সাহায্যেই তারা হাত পরিষ্কার করে। সাবান কখন যে মাটিকে বেদখল করবে তা পাঠানদের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ক্ষুধার সময় উত্তম খাদ্য পেলে লোকে আকণ্ঠ আহার করে। আমিও তাই করেছিলাম। আহার সমাপ্ত হবার পর পাঠান দেশবিদেশের গল্প শোনার জন্য গ্রামের লোকদের ডেকে আনলেন। দেখে আশ্চর্য হলাম, সেই গ্রামে একজন বাংগালীও ঘরবাড়ি বেঁধে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনিও এসে ঘরের এক কোণে বসলেন। মাঝে মাঝে বংগ দেশের এমন সব খুঁটিনাটি প্রশ্ন তিনি করতে লাগলেন যে, সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমায় রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষটায় উপায়ান্তর না দেখে বাংলা ভাষায় তাঁকে বললাম, যদিও আপনার পরনে কাবুলি পোশাক, পোস্তু ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন, তবুও আমার মনে হয় আপনি বাংলা দেশ সম্বন্ধে এমন অনেক সংবাদ রাখেন যার সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণাই ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। আমি তাঁর প্রশ্নের সব জবাব ঠিক ঠিক ভাবে দিতে না পারলেও বুঝলাম, স্বদেশকে নিকটে থেকে যতটুকু জানা যায় তার চেয়ে বেশি জানা যায় দূরে থাকলে। কারণ তখন স্বদেশের প্রতি স্বভাবতই আগ্রহ বেড়ে যায়। প্রশ্নের লহরী ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, অতি কষ্টে রাত দ্বিপ্রহরে সভা সমাপ্ত করে সেদিনের মত ক্ষান্ত হতে সক্ষম হয়েছিলাম।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আবহাওয়া একদম বদলে

গেছে। প্রভাতী সূর্য ধোঁয়াটে রঙের মত এক রকম মেঘের আড়ালে থেকে কোন মতে পৃথিবীর অন্ধকার দূর করছে। বাতাস একদম বন্ধ। তুষারপাত সত্বরই হবে মনে হল। লক্ষণ দেখে অনুমান করলাম তুষারপাত শুরু হতে আর দু সপ্তাহ লাগবে। এরূপ আবহাওয়া সাইকেলে ভ্রমণের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। বাতাস মোটেই থাকে না। প্রবল বাতাসের সংগেই তুষারপাত শুরু হয়।

সাইকেলটা বাইরে এনে পাঠান এবং তাঁর জায়গীরদারের সংগে করমর্দন করে ফের নমস্কার করলাম।

নমস্কারাদি শেষ করে পথে আসবার জন্য বেগে সাইকেল চালালাম। পথে এসে বুঝলাম পথটা ক্রমেই উঁচু হয়ে চলেছে। একবারে বেশি যেতে সক্ষম হলাম না। বার বার নামতে হয়েছিল। যখনই নেমেছি তখনই দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে তার দৃশ্য দেখেছি। সে সব দৃশ্য চিরদিন আমার মনে থাকবে। এই পর্বতমালা আফগানিস্থান হতে শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে হিমালয় হতে, এবং শেষ হয়েছে ককেশাসে এসে। পার্বত্য জাতির অনেক স্ত্রীপুরুষকে নির্ভীক স্বাধীনভাবে পাহাড়িয়া পথে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। এরূপ স্বাধীন ভাবে যারা ভ্রমণ করে তাদের দু এক জনের সংগে আমার আলাপ হয়েছিল। তাদের ভ্রমণ কথা শুনে মনে হল, ভ্রমণে যদি রোমাঞ্চ থাকে তবে তাদের ভ্রমণেই আছে। তাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার তুলনায় আমার মত পর্যটকের ভ্রমণের রোমাঞ্চকে সামান্য বলেই মনে হতে লাগল। যা হোক, বড় পথ দিয়ে চলেছি দিনের বেলায়। ডাকাত আমার মত লোকের পেছন যদি নেয় তবে সে ডাকাত ডাকাতই নয়, সে চোর অথবা ছেঁচড়। চোর ছেঁচড়ের ভয়ে যারা ভীত তারা রোমাঞ্চ অনুভব করবার ক্ষমতা রাখে না।

আমার পূর্বোক্ত আশ্রয়দাতা পাঠানের কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে লাগলাম। কারণ বিকাল গড়িয়ে এলেও কোন গ্রামের চিহ্নও দেখলাম না, জালালাবাদ আরও কতদূর কে জানে। ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যদি তুষারপাত আরম্ভ হয় তবে বাইরে থাকা ভয়ানক কষ্টকর হবে। একবার চীন দেশে তুষারপাতের সময় বাইরে ছিলাম। নানারূপ গাছ-গাছড়া থাকায় সেখানে অনেকটা সুবিধা ছিল কিন্তু এখানে সে সুবিধা নেই। চার দিকে চেয়ে দেখলাম একটিও গাছ নেই। অদূরে হয়তো গাছ আছে এই ভেবে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। একটু দূরে একটা পাহাড়ের উপর উঠে দেখি নিকটেই কতকগুলি গাছ। বাড়িঘর দেখতে না পেলেও গাছ দেখেই মনে শান্তি এল, শরীরে শক্তি এল, আমি এগিয়ে চললাম।

এই বৃক্ষরাজি আমাকে জালালাবাদের, জালালাবাদের না হোক, অন্তত যে-কোন একটা লোকালয়ের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বলে দিচ্ছিল। যতই কাছে যেতে লাগলাম ততই দু একখানা করে ঘর দৃষ্টিপথে আসতে লাগল। একজন পথিকের কাছে শুনলাম আমি জালালাবাদ শহরের কাছে এসে পৌঁছেছি। প্রবল বেগে সাইকেল চালিয়ে শহরে পৌঁছলাম। শহর শ্রীহীন। লোকজন নেই বললেই চলে। শহরের সামনেই একটা চত্বর। চত্বরটির চারদিকে পাইন বৃক্ষ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি গাছ এতই সুন্দর যে, দেখলেই পাঠানদের মাঝে সৌন্দর্য জ্ঞান আছে বলে মনে হয়। গাছদুটি সুন্দর ডাল পাতায় সমৃদ্ধ হয়ে ক্রমেই আকাশের দিকে উঠেছে। চত্বরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম, ছোট ছোট নালা বয়ে যাচ্ছে। নালাতে স্বচ্ছ জল। স্বচ্ছ জলে এলং মাছ খেলছে, দৌড়ছে, কাউকে ভয় করছে না। মাছ দেখামাত্রই বাংগালীর জন্মগত বাসনা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠল। ইচ্ছা

হল মাছ ধরি, কিন্তু মাছ ধরার সরঞ্জাম কোথায়? সুতরাং মাছ দেখেই সুখী হতে হল, মাছ ধরে খাওয়ার বাসনাকে দমন করতে হল।

গাছ এবং মাছের প্রতি আমার খরদৃষ্টি দেখে একজন যুবক আমার কাছে এল। যুবকের পরনে ইউরোপীয় পোশাক। নেকটাইটি বেশ ভালভাবেই আঁটা, মাথায় বোখারার গরম ফেজ। এরূপ ফেজ রুশ দেশে এখনও প্রচলিত আছে। যুবক এসেই আমার জাতি ধর্ম নাম ব্যবসা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। এটা আমার অভ্যাস। যুবককে নিয়ে নিকটস্থ একটা চায়ের দোকানে গেলাম। বলা বাহুল্য, চায়ের দোকানে টেবিল চেয়ার নেই, কারপেট বিছানো। দলে দলে লোক কারপেটের ওপর গোল হয়ে বসে চা খাচ্ছিল। নানা ভাষাভাষী লোকের সমাগম দেখলাম। তবে পোশাক তাদের সকলেরই এক রকমের। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে কেউ কিছু বললে না। বৈদেশিক লোক দেখে তাদের অভ্যাস আছে এবং তারা ভাল করেই জানে কোন্ বৈদেশিক কি মতলব উদ্ধারের জন্য তাদের দেশে আসে। ইতালীয়, জার্মান, জাপানী এবং বৃটিশরাই আফগানিস্থানে বেশীর ভাগ গিয়ে থাকে। রুশরা অতি অল্পই আসে, এবং এলেও তারা জালালাবাদের মত শহরে পদার্পণ করে না।

দু পেয়ালা চা নিঃশেষ করে তৃতীয় পেয়ালায় যখন চুমুক দিচ্ছিলাম তখন আরও কএকজন লোক চায়ের দোকানে প্রবেশ করল। তাদের মাথায় মাশাদী কাপড়ের পাগড়ি, পরনে পায়জামা, সার্ট এবং ইংলিশ কোট। দেখেই মনে হল এরা ছাত্র। আমার প্রথম পরিচিত লোকটির সংগে তারা করমর্দন করলে, তারপর কাছে বসে ইরানি ভাষায় কথা বলতে লাগল। এখানে ইরানি ভাষায় কথা বলা আভিজাত্যের লক্ষণ প্রকাশ করে। ছাত্রসমাজ এখানে প্রায়ই ইরানি বলে। তবে দুএক

জন পাওয়া যায় যারা পোস্ত এবং হিন্দুস্থানিই বলে বেশি। হিন্দুস্থানির অপর নাম উর্দু। উর্দু শব্দের মানে মিশ্রিত। মিশ্রিত ভাষার প্রচলন এখানে বেশ আছে। আমিও মিশ্র ভাষায়ই কথা বলছিলাম। তবে লক্ষ্মৌতে যে মিশ্র ভাষা ব্যবহার হয় এখানে তা চলতে পারে না, এবং ভবিষ্যতে কোনদিন চলবেও না। ভবিষ্যতে যে চলবে না তার নানা কারণ আছে। কথা প্রসংগে তা অনেক স্থানে বলেছি এবং কথা প্রসংগে আরও বলতে হবে।

ইউরোপীয় পোশাকে আবৃত যুবকটি ধর্মে হিন্দু। হিন্দুদের মাঝে প্রধানত চারটি সমাজ আছে। সনাতনী, আর্যসমাজী, নানকপন্থী এবং শিখ। শিখ এবং নানকপন্থীদের মাঝে প্রভেদ আচার ব্যবহারেই, ধর্মের দিক দিয়ে কোন প্রভেদ নেই। নানকপন্থীরা দাড়ি গোফ রাখে না, হাতে লোহার বালা, নেংটি এবং কৃপাণ ব্যবহার করে না। শিখরা ধূমপান করে না, তারা সেটিও করে। শিখরাও গ্রন্থসাহেব পাঠ করে, ওরাও গ্রন্থসাহেব ছাড়া অন্য কিছুর ধার ধারে না। আফগানিস্থানে আর্যসমাজীরা অপ্রকাশ্যেই থাকতে ভালবাসেন, সেজন্য তাঁদের প্রকাশ্যে কোন শ্রেণী নেই, তাঁরা সনাতনীদেরই অন্তর্ভুক্ত। ভেতরে ভেতরে কিন্তু সনাতনী এবং আর্যসমাজীদের মাঝে এত বিবাদ যে আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের মাঝেও এত বিবাদ নেই। এই বিবাদের একমাত্র কারণ হল, আর্যসমাজীদের মাঝে জাতিভেদ নেই এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। বিধবা বিবাহটা এমনিভাবে প্রচলিত যে তিন চার সন্তানের জননীকেও এরা পুনরায় বিবাহ দেওয়া কর্তব্যের মাঝেই গণ্য করে, এবং অতিবৃদ্ধ বিধবা ছাড়া অন্য বিধবাকে দেখাটাই পাপ বলে গণ্য হয়। এতে আর্যসমাজীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে আর সনাতনীরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হচ্ছে।

চায়ের দোকানে বসে কথা বলা নবাগত যুবকগণ যেন পছন্দ করলেন না। তাঁরা যেন এখান হতে উঠে গিয়ে অন্যত্র বসে কথা বলতেই চাইছিলেন। নবাগত যুবকদের মাঝে একজন তাঁর বাড়িতেই আমাকে নিয়ে যাওয়া ভাল মনে করলেন। আমরা কাফিখানা পরিত্যাগ করে শহরের মাঝে গিয়ে হাজির হলাম। ছোট খাট একটা বাজারের মাঝ দিয়ে আমাদের যেতে হল। কতকগুলি হিন্দু তাতে বেচা কেনা করছিল। আমি তাদের শুধু দেখেই গেলাম, তাদের সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না।

পাঠান ছেলেটি আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে একখানা রুমে বসাল। রুমখানা ছোট হলেও সজ্জিত। একদিকে একটি কাঠের বাক্সের উপর কএকখানা বই পড়ে আছে, কোরানখানাও সযত্নে কাপড়ের দ্বারা বেঁধে একটি ছোটখাট তাকে রাখা হয়েছে। ঘরে একখানাও টেবিল চেয়ার ছিল না। ঘরের মাঝেই একটি ছোট গর্ত, তাতে রাত্রে ছোট একটি কাঠকয়লার আগুন জ্বালানো হয় এবং যদি বেশি শীত পড়ে তবে বিছানাটা টেনে নিয়ে তারই কাছে শুতে হয়।

ছেলেটি তার পিতাকে আমার আসার সংবাদ দিল। প্রৌঢ় পাঠান আমাকে সম্বর্ধনা করবার জন্য এলেন এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করেই তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে গেলেন। তাঁর ব্যস্ততা দেখে মনে হল, তিনিও একটি ভোজের বন্দোবস্ত করবেন। এতে এই যুবকদের ভয়ানক ক্ষতি হবে তাই যুবকদের বলে দিলাম, যদি বাজে লোক এসে ঘর ভর্তি হয় তবে তোমাদের সমূহ ক্ষতি হবে, আমার কাছ হতে যা জানবার তার কিছুই জানবে না। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার বাবাকে ভোজের বন্দোবস্ত করতে মানা করলে এবং তাকে ডেকে নিয়ে এল।

গৃহস্বামী আমাকে কএকটি প্রশ্ন করলেন, তার প্রত্যেকটি এখনও

আমার মনে আছে। রুটি খেতে ভালবাসি, না ভাত খেতে ভালবাসি এই গোছেরই ছিল প্রশ্নগুলি। আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়ে গেলে আমরা চা খেলাম। তারপরই শুরু হল আমার ভ্রমণ কথা। সুখের বিষয়, ছাত্ররা কখনও জিজ্ঞাসা করেনি কটা বাঘ এক সংগে আমাকে আক্রমণ করেছিল; ডাকাতের দল পথে ওত পেতে বসে রয়েছিল কিনা। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, চীন দেশের ছাত্রদের কথা; জাপানীরা কি সত্যিই হারিকিরি করে নিজের সম্মান, দেশের এবং রাজার সম্মান বাঁচাবার জন্যে? নতুন ধরনের নতুন প্রশ্ন। এরা নতুন করে প্রশ্ন করবে না কেন তা বোধ হয় আমাদের জানা নেই। জন্মের পর হতেই এরা শুনছে রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা। এরাও বৃহৎ কারণে মরণকে তুচ্ছই জ্ঞান করে, সেজন্যই বাঘের কথা ডাকাতের কথা জিজ্ঞাসা করাটা ওদের মনেও হয় না।

আমি স্থানীয় হিন্দুদের কথা উঠালাম। একজন বললে, এরা আজব লোক। সকল সময়ই এদের পরমার্থিক চিন্তা এবং কি করে গ্রামকে গ্রাম করায়ত্ত করা যায় তারই চেষ্টা। এরা কখনও কূটনীতিতে যোগ দেয় না, যখনই যিনি রাজা হন তারই আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, গতানুগতিক অবস্থার ব্যতিক্রম তারা ভাবতেও পারে না। সরকারী ব্যাংকের অর্ধেক অংশ হিন্দুদেরই। যত জমি দেখতে পাওয়া যায় তার সমুদায়টা তাদেরই। অথচ তারা নিরীহ এবং সকলকেই ভয় করে চলে।

আমাদের দেশের নবাব সিরাজের কথা এখনও লোকে বলে; এমন লোকও আছে যারা সিরাজের জন্য চোখের জলও ফেলে। তারপর যারা আরও একটু উচ্চস্তরের, তারা পঞ্চ ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেন এদের কথা বলে আসর গরম করে তোলেন। আমার জন্ম ও বৃদ্ধি এই

সমাজেই। আমার মাঝে এই সমাজের দোষগুণ সবই আছে। সেজন্যই বোধহয় রাজা আমান উল্লার কথা এদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু এরা কোন রাজার কথা কোনমতে একবারও বললে না। রাজভক্তি না থাকলে প্রজার প্রজাত্ব থাকে না, এদের মাঝে যেন প্রজাসুলভ ভাব নেই, এরা নিজেরাই যেন রাজা। অথচ যখনই কোন ভারতবাসীর সংগে আফগানিস্থানে দেখা হয়েছে তখনই তিনি রাজাদের চৌদ্দপুরুষের ইতিবৃত্ত বলতে কসুর করেন নি। আমি এই যুবকদের কাছে সেরূপ কিছুই না পেয়ে একটু দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশে রাজতন্ত্রের মহিমা প্রচারের জন্যে 'দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা' কথাটা সৃষ্ট হয়েছিল; অতএব আমার মত লোক সেই ধুয়ার জের না টেনে যায় কোথায়। নিজের দেশে যদি রাজা না থাকে তবে অপরের দেশের রাজার কথা শ্রবণ করেও আমাদের আনন্দ হওয়ার কথা।

পাঁচ

পর্যটকের কাজই হল একদেশের সংবাদ অন্য দেশে বহন করে নিয়ে যাওয়া। এখানে সংবাদ পাবার বদলে সংবাদ দিতেই হল, সংবাদ পাওয়া গেল না। অনেক চেষ্টা করেও ওদের কাছ থেকে বের করতে পারলাম না কি করে আমান উল্লা দেশত্যাগী হলেন, এমন কি বাচ্চা-ই-সাক্কো কোথায় কি ভাবে হত হয়েছিলেন তাও তারা বললে না। বাধ্য হয়েই আমাকে অপরাপর কথা নিয়েই সময় কাটাতে হল। সেই কথাগুলির মাঝে ছিল বোখারার একটি বিশেষ ঘটনা। এই ঘটনাটিই নীচে বলছি গল্পের আকারে।

উত্তর পশ্চিম দিক হতে প্রবল বায়ু বইছিল। তুষারপাতের বড়ই সম্ভাবনা, তা সত্ত্বেও একটি যুবক বোখারার বিপরীত দিকে একরূপ

দৌড়েই যাচ্ছিল। যুবক গন্তব্যস্থানে পৌছার পূর্বেই তুষারপাত শুরু হল। তুষারপাতে সে অভ্যস্ত বলেই এই দুর্যোগেও চলতে তার বাধেনি। তার স্ত্রীর অভুক্ত মুখ যখনই মনে পড়ছিল, তখনই তার শরীরের রক্ত যেন আগুনের মত হয়ে উঠছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ সে এভাবে চলতে পারেনি, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে স্তূপাকৃতি বরফের উপর পড়ে গেল। অন্যদিকে রুশ দেশের সীমান্তরক্ষীরা যুবকের উপর দুরবীনের সাহায্যে লক্ষ্য রেখেছিল। যুবককে পড়ে যেতে দেখে একজন সীমান্তরক্ষী দৌড়ে এসে তাকে উঠিয়ে তার মুখে ওয়াতকি (রুশ দেশীয় মদ) ঢেলে দিল এবং হাতে দিল কতকটা কন্যাক (রুশ দেশীয় কড়া মদ) ঘসে। যুবকের জ্ঞান হল কিন্তু জ্ঞান হবার পর যখন সে বুঝল যে তাকে মদ খাইয়ে রুশরা বাঁচিয়েছে, তখন রুশদের সে খুব গালিগালাজ করলে। বললে, মদ খেয়ে জীবন লাভ করার চেয়ে মরাই তার পক্ষে ভাল ছিল। আল্লার কাছে এই হারাম খাওয়ার জন্যে কি জবাব সে দেবে? কিন্তু সংগে সংগে যেই তার অভুক্ত স্ত্রীর কথা মনে হল অমনি তার জীবনদানের জন্য রুশীয় রক্ষীদের সে ধন্যবাদ জানালে এবং তাদের করমর্দন করে নিকটস্থ একটা মুসলমান কাফেতে গিয়ে প্রবেশ করল। কিন্তু আবার সে চৈতন্য হারাল। যারা তার শুশ্রূষা করতে এসেছিল তারা যেই টের পেল তার মুখে মদের গন্ধ, অমনি তারা সরে দাঁড়াল। মাতালকে সাহায্য করা আর নরক যাত্রার পথ পরিষ্কার করা একই কথা। সুতরাং কেউ তার কাছে এল না। পুলিশ এসে তাকে বেশ দু ঘা লাগিয়ে তার অজ্ঞান দেহটাকেই হাজতে নিয়ে পুরে রাখল। একটা সংজ্ঞাহীন লোককে এভাবে হাজতে নিয়ে যেতে দেখেও কেউ কোন প্রতিবাদ করলে না।

রাত্রেই মামুদের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু তার শরীরে শক্তি

ছিল না। ভিজা মেজেতেই তাকে পড়ে থাকতে হল। সে ভাবছিল কেন আমিনাকে সে বিয়ে করল? আমিনা নির্দোষ বালিকা। তারই জন্য সে তার শিয়া পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে একজন সুন্নি যুবককে বিয়ে করল। যদি তাদের বিয়ে না হত, তবে আমিনাকে তার পিতা পরিত্যাগ করতেন না, আমিনাও না খেতে পেয়ে আজ মৃত্যুর সম্মুখীন হত না। রাত চারটার সময় মামুদ উঠে বসল। সে আল্লার দরগায় প্রার্থনা করল। বললে, হে আল্লা আমি কোন পাপ করিনি, আমাকে বাঁচাও, আমার আমিনাকে রক্ষা কর। কিন্তু সকাল বেলাই কাজির বিচারে মামুদের ছ মাসের জেল হয়ে গেল।

অনাহারে আমিনা দুদিন কাটাল, তারপর সে ঘরে দরজা দিয়ে গরম জল খেতে লাগল, কিন্তু শুধু গরম জল খেয়ে কি কেউ বাঁচে? সে পবিত্র কোরান হাতের কাছে রাখল। যখনই তার ক্ষুধা অসহ্য হতে লাগল তখনই সে কোরান হতে বয়েত পাঠ করে মনের মাঝে তার ছবি আঁকতে লাগল। মনে মনে স্বামীর নির্বিঘ্নে আসার জন্যে সে প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু আমিনার কোন প্রার্থনা ভগবানের কানে পৌঁছল না। সাইবেরিয়ার নেকড়ের দল তুষারপাতের সংগে সংগেই শহরে এসে অত্যাচার শুরু করল। মেষ, কুকুর, ঘোড়া, গর্দভ, মানুষ যাকে সামনে পায় তাকেই খেয়ে পেট ভরতে লাগল। আমিনার দরজা সাধারণ ওক কাঠের। একটি নেকড়ে লাফ দিয়ে দরজাতে এসে পড়তেই দরজাটি চুরমার হয়ে গেল। আমিনাও নেকড়ের উদরস্থ হল, পড়ে রইল শুধু তার কখানা হাড়, আর তারই পাশে পড়ে রইল ছিন্ন কোরান।

ক্রমে তুষারপাত শেষ হল। গাছপালা সজীব হয়ে উঠল, প্রান্তর প্লাবিত করে সূর্যকিরণ ঝলমল করে উঠল। কিন্তু দেখা গেল, পথে

ঘাটে মাঠে ছড়িয়ে আছে মানুষের আর নানা জীব জন্তুর হাড়। সূর্যকিরণ পড়ে হাড়গুলি চকচক করছে—একদিন এই হাড়গুলিতে প্রাণের স্পন্দন ছিল উজ্জ্বল কিরণমালা যেন তাই ইংগিত করে বলছে।

যে সকল লোক অভুক্ত, রোগে জীর্ণ, গৃহহীন তারাই ছিল বাইরে। তারাই বরফে জমে মরেছে, নয় নেকড়ের উদরস্থ হয়েছে। তাদেরই হাড় পড়ে আছে। এদের স্বর্গবাসের ব্যবস্থার জন্য মোল্লার দল বের হলেন। যাকে যেখানে পারলেন সেখানেই কবর দিলেন। কেউ বলতে লাগলেন, এরা ছিল কামনার দাস, এদের কামনা শেষ হয়েছে। হে শেখ সাদী, তোমার অমর বাণী আজ এমনি করে প্রমাণিত হচ্ছে, এদের আশার পরিসমাপ্তি হয়েছে। মুক্ত দরজা দিয়ে আলো এসে আমিনার হাড়কখানিতেও ঠিকরে পড়ছিল—হাড়গুলি উজ্জ্বল সূর্য কিরণে যেন হাসছিল। মোল্লারা যখন আমিনার ঘরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমিনার হাড় উপহাস করেই যেন বলছিল, আর তোমাদের দরকার নেই, আশার নিবৃত্তি এবার হয়েছে। মোল্লার দল ইতস্তত করছিল আমিনাকে কবর দেবে কি না। একজন বললেন, হাজার হোক ইসলামি ধর্মের তো, কবর দেওয়া দরকারই।

ঘরে প্রবেশ করে যখন তারা দেখলেন ছিন্ন কোরানের পাতাগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে, তখন আর তাদের সাহস হল না আমিনাকে কবর দিতে। পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা যে করে তার আবার কবর কি। জাহান্নামই তার উপযুক্ত ঠাঁই। কোরানের ছেঁড়া পাতাগুলি মোল্লারা নতজানু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে গেলেন, আমিনার হাড়গুলি যেমনভাবে ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল তেমনি ভাবেই পড়ে রইল।

মামুদ প্রকৃতিস্থ হয়েছে। সে এখন খোদার উপর সব ছেড়ে দিয়ে জেলদারোগার খিদমত করতে লাগল। জেলদারোগা একদিন

মামুদকে ডেকে নিয়ে বললেন, এখানে কটা মেডিকেল ছাত্র আছে তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখো তো।

মামুদ হাঁ বলেই আপন কাজে গেল। সে কাজ করছিল মন দিয়েই, এমন সময় একটি সুন্দর যুবক এসে বললে, মামুদ, দারোগা তোকে কেন ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রে?

মামুদ মাথা নত রেখেই বললে, তোমাদের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হয়েছে।

—তুই কি দৃষ্টি রাখবি বলতে পারিস?

—সে কথাতো দারোগা বলেনি।

এর বেশি আর কথা হল না। কিন্তু মামুদ বুঝলে, এই শিক্ষিত লোকগুলিকে দারোগা ভয় করে। সে জানত সুলতানকে আল্লা পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে আইন বজায় রাখতে। তাঁকে যারা সাহায্য করে তারাও খোদার বিশেষ প্রিয়পাত্র। যারা আল্লার ভক্ত তারা কেন এসব শিক্ষিত লোককে ভয় করে, তার কারণ মামুদ নিজের মনের মাঝেই খুঁজছিল।

মেডিকেল ছাত্ররা মামুদকে প্রায়ই নানারূপ প্রশ্ন করত, কিন্তু মামুদ কিছুই বলত না। একদিন কিন্তু তাকে মুখ খুলতে হয়েছিল। সে তার প্রাণের মাঝে জমানো সকল কথা মেডিকেল ছাত্রদের বলেছিল। মেডিকেল ছাত্ররা তাকে ঘৃণা করবে দূরের কথা, বরং সাহায্যই করেছিল। মামুদ কখনও মনে করেনি, সম্মানিত পরিবারের কোন লোক তার প্রতি এত সহানুভূতি দেখাবে। সামান্য সহানুভূতি পেয়েই মামুদ অনেকটা শান্ত হয়েছিল। সম্মানিত লোকের কাছ থেকে সে কেন, তার বংশের কেউই সেরূপ সহানুভূতি পায়নি। বড় লোকের সংগে

তাঁতির ছেলের কি সম্বন্ধ হতে পারে ? শুক্রবারে নামাজের বেলা মাত্র বড় লোকের সংগে নামাজ পড়তে পায়, তার বেশি নয়।

মামুদের মন ক্রমেই ছাত্রদের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। সে কোরানের বয়েত ভাল করেই জানত, এবার সে অক্ষর পরিচয়ে মন দিল। চতুর লোক নিরক্ষরকে অক্ষর শিক্ষা দিতে সত্বরই সক্ষম হয়। মামুদ অক্ষর শিখে বই পাঠে মন দিল। যে সকল বই সে পড়তে লাগল তা অন্য ধরনের।

ছয় মাস জেল-জীবন কাটিয়ে মামুদ চলল তার আমিনার সংবাদ নিতে। পায়ে হাঁটা পথে মামুদের সাত দিন লেগেছিল বোখারায় পৌছতে। বোখারা তখন বরফাবৃত। একটা গাছও সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। পথের দুদিকে জীব-জন্তুর কংকাল পড়ে আছে। মামুদ আমিনার কথা যখনই ভাবছিল, তখনই অমংগলের চিন্তা তাকে দমিয়ে দিচ্ছিল। অতিকষ্টে যখন সে আমিনার ঘরে পৌছল, তখন দেখল ঘরের মেঝেতে নর-কংকাল পড়ে আছে। আমিনার পায়ের জুতার একপাটি একদিকে এবং অন্যপাটি আরেক দিকে নিক্ষিপ্ত। দুখানা জুতাকেই সে হাতে নিয়ে দেখল তাতে রক্তের চাপ গাঢ় হয়ে রয়েছে। মামুদের কঠিন হাতের মুঠোর চাপে সেই জুতা থেকে শুকনা রক্তগুলি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মাটিতে ঝরে পড়ল। আমিনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও গেল। মামুদ বুঝল তার আমিনা আর নেই। সমাজ পরিত্যক্ত আমিনা ক্ষুধায় মরেনি, নেকড়ে বাঘে খেয়েছে। যদি সমাজ তাকে পরিত্যাগ না করত তবে আমিনা মরত না, বেঁচেই থাকত। আমিনার অপমৃত্যু হয়েছে। মামুদ আমিনার হাড়গুলি জমিয়ে হাতের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে হাড়গুলি তাতে কবর দিল। শহর হতে একখানা কাঠ সংগ্রহ করে এনে তার উপর লিখল, আমিনার মৃত্যু

হয়েছে সামাজিক অত্যাচারে। তারপর মামুদ সেই কাঠটি আমিনার কবরের উপর দাঁড় করিয়ে মুখ ফিরিয়ে রওয়ানা দিল, যে পথে সে এসেছিল, সেই পথেই। এবার তাকে সাতদিনে রুশ সীমান্তে পৌঁছতে হয়েছিল, কারণ সে দুর্বল। রুশ সীমান্তে পৌঁছে আর সে দাঁড়াল না, রুশ দেশে প্রবেশ করল, মজুর দলে ভিড়ে পড়ল, কাজ করতে লাগল। খাদ্যের অভাবে যে শরীর নেতিয়ে পড়েছিল, তাই সে নতুন করে গড়ে তুলল। মামুদের মনে জাগল বোখারার সমাজকে শুধরাবার আকাঙ্ক্ষা। মামুদ কাজ এবং কমিউনিজমের পাঠ একই সংগে চালাল।

দু বৎসর রুশ দেশে থেকে মামুদ বজ্রমুষ্টি উপরে উঠিয়ে প্রতিজ্ঞা করল, যতদিন মজুর এবং কৃষকের প্রাপ্য সে আদায় না করবে, যতদিন বোখারাকে সে সোসিয়েলিস্ট স্টেটে পরিণত না করবে, ততদিন সে রুশ দেশে ফিরে যাবে না। তারই মত অক্লান্ত কর্মীদের সহায়তায় মামুদ ১৯২০ সালে সোসিয়েল রিভলিউসন করল, এবং তাতে কৃতকার্য হয়ে আমিনার মত শত সহস্র রমণীকে হারেম হতে মুক্ত করল। বোখারা দেশ রুশ সভার (সভিয়েটের) অন্তর্ভুক্ত হল।

কিন্তু মামুদ এবং তার সহকর্মীদের মনে শান্তি ছিল না। তারা যেমন কাজ করে যাচ্ছিল তেমনি তাদের ভয়ও হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী কুচক্রীদের নৈকট্যের জন্য।

১৯২২ সালে হঠাৎ আনোয়ার পাশা প্যান্-ইস্লাম এবং প্যান-তুরস্কের নিশান উড়িয়ে বোখারার দিকে অগ্রসর হলেন। যারা বিনা পরিশ্রমে অপরের রক্ত শোষণ করে আরাম করে খেত তারা আনোয়ার পাশাকে স্বাগত করল, কিন্তু কৃষক এবং মজুর এই শত্রুদের কিছু না বলে পেছন দিকে আক্রমণ করল এবং দুঘণ্টার মাঝে আনোয়ার পাশাকে ধরাশায়ী করে দেশকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে

আনল। ঘরে ঘরে মুক্ত কণ্ঠে বেজে উঠল আমিনার কথা—যে মরে গিয়ে তাদের মুক্তি দিয়েছে।

ছয়

গল্পটি যদিও ছোট তবুও মর্মস্পর্শী। গল্প শেষ হয়ে গেলে যে ছেলেটি সব চেয়ে ছোট সে বললে, আমরা হিন্দুদের ভয়ানক ভয় করি। হিন্দুরা কখনও কোন বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। যখনই যে দল জয়ী হয়েছে তারা সেই দলেরই মন যুগিয়ে চলেছে। এদের নিজেদের কোন স্বাধীন সত্বা নেই। এরা নিয়মানুগ নিরীহ রাজভক্ত প্রজা। বর্তমানে "সরকতে আসম" অর্থাৎ কাবুল ব্যাংকের অর্ধেক অংশ হিন্দুদের, বাকি অর্ধেক রাজ পরিবারের। প্রকৃত পক্ষে রাজপরিবারের সংগে হিন্দুদের অর্থনীতির দিক দিয়ে বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে।

ছেলেটিকে হঠাৎ একজন বয়স্ক যুবক বাধা দিয়ে বললে, এসব বাজে কথা রেখে দাও হে, এখন আমরা আরও গল্প শুনব, শুধু হিন্দু আর রাজপরিবারের কথা শুনে কাজ নেই। দুনিয়ার অনেক কিছু জানবার রয়েছে।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, একে বলতে দিন, বাধা দিচ্ছেন কেন।

ছেলেটি বললে, আপনাকে কি আর বলব, আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে গেছে।

কথা আরও অনেক হয়েছিল, কিন্তু এখানে তা বাড়িয়ে লাভ নেই।

পরদিন প্রাতে স্থানীয় হিন্দুদের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার সংগে একজন পাঠানও ছিলেন। পূর্বেই বলেছি হিন্দুরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্যসমাজীরা নমস্কারকে বলে "নমস্তে," সনাতনীরা

বলে "জয় ধরম কি, জয় গোপালজী কি" শিখরা বলে "সৎ-শ্রী-আকাল"। নানকপন্থীরা সবই বলে। এর মানে হল নানকপন্থীরা সুবিধাবাদী। যে যে-কথায় খুশী হয় তাকে সেই ধর্মেরই প্রচলিত অভিবাদনের শব্দ দ্বারা সন্তুষ্ট করে। আমি এত কথায় না গিয়ে শুধু নমস্কারই বলতাম। কিন্তু এতে একমাত্র আর্যসমাজী ছাড়া আর সবাই আমাকে বিতৃষ্ণার চোখে দেখতে লাগল। এমন কি আমাকে কিছুমাত্র ভদ্রতা দেখাতেও তারা কুণ্ঠিত হতে লাগল। কিন্তু এদের দ্বারে আমি ভিক্ষা পাবার জন্যে যাইনি, সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। তাই একজনকে বললাম, তোমাদের কাছে আমি ভিক্ষা চাইতে আসিনি, তোমাদের অবস্থা অবগত হতে এসেছি মাত্র। আমার সংগে কথা বললে তোমরাই উপকৃত হবে।

আমার কথা শুনে কএক জন হিন্দু এমন ভাব দেখাতে লাগল যে তারা যেন হতভম্ভ হয়ে গিয়েছে। আসল কথা হল, এরা বুঝতে পেরেছিল আমি সত্যিই ভিখিরি নই, চাইতে আসিনি বরং দিতে এসেছি। নিমেষে তাদের আচার আচরণের পরিবর্তন হল, আদর আপ্যায়ন শুরু হল।

আমি হিন্দুদের লক্ষ্য করে বললাম, এখন স্থির হয়ে আমার কথা শোন। তোমাদের যা বলবার তা এমন ভাষায় বলবে, যে ভাষা আমার সংগের পাঠানটিও বুঝে। তোমরা আরবি এবং ফারসি কথার বেশি ব্যবহার কর বলেই আমাকে এত কথা বলতে হল। এখন বলতো ভায়ারা জীবন কাটছে কেমন? জবাব সেই একই ভারতীয় ধরনের— দিন কেটে যাচ্ছে কোন মতে। এদের এরূপ প্রাণহীন মামুলি কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না। পাঠানের দেশে এসেছি পাঠানের মত কথা শুনতে চাই। পাঠানরা কখনও বেঁচে আছি মাত্র, কোনরূপে দিন কেটে যাচ্ছে এসব কথা বলে না। তারা বলে—ভাল আছি, শক্তি আছে, মন খুশী আছে।

কথার মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হিন্দুদের নাকি গ্রাম হতে সরিয়ে এনে শহরবাসী করা হয়েছে, তার কারণ কিছু বলতে পার ?

একজন বললে, কারণ তো কিছুই জানি না, তবে এই মাত্র জানি এটা সরকারী আদেশ। সরকারী আদেশ মেনে চলাই আমাদের ধর্ম। সেজন্যই পৈতৃক ভিটা ছেড়ে চলে এসেছি।

সংগের পাঠানটি বললে, এরা কি কারণে শহরবাসী হয়েছে, তা ওদের মুখে শুনতে পাবেন না। আমি বলছি শুনুন। যে সকল গ্রামে এখনও হিন্দুর বাস আছে এবং পূর্বে যে সকল গ্রামে হিন্দুর বাস ছিল, তাদের কাছে সবাই টাকা ধার করে। টাকা সুদে আসলে সকলে পরিশোধ করতে পারে না। তারই ফলে চাষাদের জমি আপনি মহাজনদের মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়। হিন্দুদের হাতে জমি চলে গেলে কোনরূপ ক্ষতি হত না যদি হিন্দুরা নিজে জমি চাষ করত, কিন্তু জমি চাষ করে মুসলমানরা। মুসলমানরা সাধারণত একগুঁয়ে এবং গোঁয়ার হয়। অপরের জমি চাষ করে অর্ধেকটা ফসল দিয়ে দেওয়া তাদের ধাতে সহ্য হয় না। এদিকে আইনও অমান্য করতে পারে না। সেজন্য আধমনা হয়ে অনিচ্ছায় কাজ করে। তারই ফলে আফগানিস্থানে ফসলের অভাব। আফগানিস্থানকে ফসলের অভাব থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দুদের গ্রাম হতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীতে কেউ পুরাপুরি সাধু হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেকেরই লোভ ক্রোধ ইত্যাদি রিপু অল্পবিস্তর আছে। গ্রামে থাকতে হলে নানারূপ জটিলতার মাঝে জীবন যাপন করতে হয়। অনেক সময় মারামারি কাটাকাটিও হয়ে যায়। আফগানিস্থানের হিন্দুরা গ্রামে বাস করে গ্রামের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে ভালবাসে কিন্তু গ্রাম্য জীবনের কষ্ট সহ্য করতে রাজি নয়। চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে

দিতে এরা বেশ পটু কিন্তু কেউ যদি একটা চড় মারে তবে সেই চড় ফিরিয়ে দেবার শক্তি নেই। গ্রামের লোকের খবরদারি করতে পুলিশ সব সময় সক্ষম হয় না। নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হয়। কিন্তু হিন্দুরা এদিকে একেবারে উদাসীন। যাদের আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা নেই তাদের গ্রামে বাস করা উচিত নয়। আফগান সরকার শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের শহরবাসী করে ভালই করেছেন।

আমার পোশাক হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মাথায় শোলার হ্যাট, গায়ে কোট এবং পরনে ব্রিচেছ। পাক্কা কাফেরি ধরনের পোশাক। এরূপ পোশাক সাধারণত হিন্দুরা ব্যবহার করতে সাহস করে না। তাদের ধারণা, এরূপ পোশাক পরলে ইউরোপীয় সভ্যতা-বিরোধী পাঠানগণ তাদের হত্যা করবে। সেজন্যই একজন জিজ্ঞাসা করেছিল আমার প্রাণের মায়া আছে কি না? আমার প্রাণের মায়া তখনও ছিল এখনও আছে, তা বলে সকল কাজেই কসাইখানার জানোয়ার হতে আমি রাজি নই। আমি ওদের বলতে বাধ্য হলাম, তোমরা যে ভাবে থাক সে ভাবে আমি জীবন ধারণ করতে রাজি নই। আমার পোশাক আমার ইচ্ছামত পরব, কেউ যদি প্রতিবাদ করে তবে অন্তত পক্ষে আমার যা শক্তি আছে তারই উপযুক্ত ব্যবহার করব।

সংগের পাঠান ছেলেটির কাছে আরও শুনলাম, এরা একে অন্যে যখন ঝগড়া করে তখন মারামারির পরিবর্তে একে অন্যের কাপড়ই ছেঁড়ে। একজনের কাপড় যখন অন্যজন ছিঁড়তে আরম্ভ করে তখন পরস্পরে চিৎকার করে হট্টগোল বাধিয়ে দেয়। পাঠানরা কখনও এরূপ দাংগা মেটাতে যায় না। দূর থেকে দেখে আর হাসে।

এদের কাছ হতে বিদায় নিয়ে সেদিনটি ঘরে কাটিয়ে পরদিন ফের পথে বেরিয়ে পড়লাম। এখান হতে কাবুলে দুটি পথ গিয়েছে।

একটি পথ চারবাগ এবং বেস্থধ হয়ে সোজা এক নম্বর কাবুলে গিয়েছে। আমার সেদিকে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু লোকমুখে শুনলাম এই পথে জলের বড়ই অভাব, যদিও কাবুল নদী ঐ পথেই বয়ে এসেছে। পাঠানদের কথা বিশ্বাস করতে হয় কারণ তারা না জেনে কোন কথা বলে না। দ্বিতীয় পথটি নিম্‌লা এবং দুই নম্বর কাবুল হয়ে প্রথম নম্বর কাবুলে পৌঁছেছে। প্রথম নম্বর কাবুল হল আফগানিস্থানের রাজধানী বা পায়তক্ত। দুই নম্বর—কাবুল হল কাবুলের কাছেই একটি ছোট গ্রাম। এই গ্রামটির নামমাহাত্ম্য প্রথম নম্বরের কাবুল হতেও বেশি। পূর্বকালে অনেকে আসল কাবুল ভুল করে নকল কাবুলে তাঁবু গেড়েছেন আর আসল কাবুল হতে সেপাই এসে অতর্কিতে আগন্তুক আক্রমণকারীর সর্বনাশ করতে সক্ষম হয়েছে। কোনও বৃটিশ জেনারেল নাকি নামের ভুলে দুই নম্বর কাবুলেই নির্বংশ হয়েছিলেন। আকবর হতে আওরংজেব বাদশার অনেক জেনারেল শুধু নামের ভুলেই নাকি কাজ করতে না পেরে আফগানিস্থান হতে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। হতে পারে এসব উপকথা, কিন্তু এই উপকথার মাঝে কিছুটা সত্য আছে বলেই আমার বিশ্বাস। নকল কাবুল অথবা দুই নম্বর কাবুলের কথা যথাস্থানে বলা হবে।

মানচিত্রে জালালাবাদ এবং কাবুলের সঠিক দূরত্ব ঠিক করা বড়ই কঠিন। সেজন্য অনির্দিষ্ট দূরত্বের জন্য তৈরি হয়েই পথে বের হতে হল। এদিকের পথ পার্বত্য। মোটরকারের পক্ষে বেশ উপযোগী বলতেই হবে, কিন্তু বাইসাইকেলের পক্ষে উপযোগী মোটেই নয়। পথের উপর ছোট বড় পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। যখনই সাইকেলের চাকা এরূপ পাথরের উপর গিয়ে পড়ে তখনই সাইকেল ছিঁটকিয়ে যায় এবং শরীরে বেশ ঝাঁকুনি লাগে।

এদিকের পথে অনেকগুলি গ্রাম আছে। কোন গ্রামে মানুষের বসবাস আছে আর কোন গ্রামে লোকজন মোটেই নেই। দারিদ্র্যই বোধ হয় এর একমাত্র কারণ। আফগানিস্থান স্বাধীন বটে, কিন্তু এখনও আদিম যুগের দৈন্য এড়িয়ে যান্ত্রিক যুগে পৌছতে পারেনি। যান্ত্রিক যুগে পৌছতে হলে শুধু স্বাধীনতাই সাহায্য করে না, আর্থিক এবং সামাজিক পরিবর্তনেরও সমূহ দরকার হয়। সেদিকে আফগানিস্থান ভারতের পেছনে বললে কোন দোষ হবে না। রাজা আমান উল্লা সেদিকে মন দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু এরই মাঝে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। একটি বিদ্রোহ শেষ হবার পর আর একটি, তারপর নাদির সাহের হত্যা। এরূপ দ্রুত রাষ্ট্রবিপ্লবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে আসে দুর্ভিক্ষ এবং নানাপ্রকারের রোগ ইত্যাদি। আফগানিস্থানে দুর্ভিক্ষ এসেছিল কি আসেনি সে সংবাদ আমি রাখিনি, তবে চোখে দেখেছি এদিকের লোক এখনও ম্রিয়মান অবস্থায়ই আছে।

আন্দাজ তিরিশ মাইল পথ চলে একটি ছোট গ্রামে এলাম। গ্রামটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত। গ্রামের পাশ দিয়ে একটি ছোট জলস্রোত বয়ে চলেছে। তারই স্বচ্ছ জলে হাত মুখ ধুয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে যাচ্ছি এমন সময় কএকটি কুকুর এসে আমাকে আক্রমণ করল। এদের মাঝে একটিও বুলডগ না থাকায় আমি ওগুলোকে ঢিল মেরে যখন তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম, তখন একজন লোক নিকটস্থ একটা ঘর হতে বেরিয়ে এল। লোকটি পাতলা এবং গৌরবর্ণ। ফারসি ভাষায় সে আমার সংগে কথা শুরু করল। ফারসি ভাষায় কথা বলাটা যেন একটা বাহাদুরি। আমি হিন্দুস্থানিতে বললাম, ফারসি ভাষা মালুম নেই। তখন লোকটি আমার সংগে হিন্দুস্থানি ভাষায়ই কথা বলতে শুরু করল। হিন্দুস্থানি সে বেশ বলতে পারত। তাকে জিজ্ঞাসা

করলাম এখানে রাত কাটাবার কোথাও স্থান হবে কি না। সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তার সংগে যেতে বলল। আমি তার সংগে চলে একটি একচালা মেটে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজায় তালা লাগান ছিল। তালা খুলে দিয়ে সে একটা চারপাই দেখিয়ে বললে, এই চারপাইএর ওপর বসুন, আমি খাবারের এবং বিছানার বন্দোবস্ত করছি। এই বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল, কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে ফিরে এসে বললে, এক চারপাইএর ওপর দুজনায় শুতে আপত্তি নেই তো? আমি বললাম, মুসাফির কখনও অন্যলোকের সংগে শোয় না, একথা কি আপনি জানেন না? মাথা নত করে লোকটি ফের চলে গেল।

একচালা মেটে ঘরটি বেশ বড়। তার এক পাশে একটা বড় চারপাই পড়ে ছিল এবং তাতে বিছানাও পাতা ছিল। পাঞ্জাবী ধরনের চারপাইএর ওপর মোটা লেপ তোশক পাতা দেখে ইচ্ছা হল একটু শুয়ে নিই, কিন্তু সে লোভ সংবরণ করতে হল, অপরের বিছানায় বিনা অনুমতিতে শোয়া নেহাত অন্যায় হবে ভেবে। আমি খালি চারপাইটার ওপরই বসে রইলাম।

কতক্ষণ পর লোকটি আরও কএকজন লোক নিয়ে ফিরে এল। তাদের কএকজন এসেই আমার সংগে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন বলেই মনে হল। যারা আমাদের কথা বুঝতে পারছিল না তারা আমাদের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। যাঁরা বাংলা ভাষা বলছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার খুঁটিনাটি বিষয়গুলি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। এদের বাংলা ভাষা শিক্ষা লগনী কারবার উপলক্ষে কলকাতা আসার ফলেই হয়েছিল। রাত্রে খাওয়ার ও থাকার বন্দোবস্ত হল কিন্তু কলকাতা ফেরত পাঠানদের ভাবিত হয়ে

পড়তে দেখে বললাম, এটা কলকাতাও নয়, ইণ্ডিয়াও নয়, এখানে আমি আপনাদেরই বাড়িতে খাব। অবশ্য কথাটা বলতে বেশ লজ্জাই হয়েছিল। একজন পাঠান বললে, আপনি "ঢাক্ বাংগালের" লোক, জাদু নিশ্চয়ই জানেন। এখানে "জাদু" মানে মন্ত্রগুণ। আমি মন্ত্রগুণ অবিশ্বাস করি জানালাম। তখন সে বললে, তবেতো আপনি নিশ্চয়ই বাহাদুর বাংগালী হবেন। বাহাদুর বাংগালী মানে, যাদের বৃটিশ সরকার টেরারিস্ট নাম দিয়েছেন। কথাটার জবাব না দিয়ে এক কোণে চুপ করে বসা একটি পাঠানকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনিও বোধহয় বাংলা জানেন?

—নিশ্চয়ই জানি মহাশয়, আমি সদিয়া পর্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি। আপনি দয়া করে আমার বাড়িতে আসবেন কি?

আমি বললাম, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে যে ভদ্রলোক আমাকে প্রথম ডেকে এনেছেন তাঁর অনুমতি চাই।

সেই লোকটি কাছেই দাঁড়ান ছিল। সে আমাকে যাবার আদেশ দিল। আমি তৎক্ষণাৎ আলিজানের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম।

আলিজান এখানকার বর্ধিষ্ণু লোক, তাঁর অনেকগুলি ঘোড়া খচ্চর ও উট আছে, চষবার জমি আছে, পরিবারে অনেকগুলি লোক আছে। তাঁর কএকটি ছেলে এবং মেয়েও হয়েছে। মেয়ে হওয়াটা পাঠানদের পক্ষে সৌভাগ্য। তিনটি মেয়ের পিতার সম্মানের অবধি নেই। আলিজানের বাড়িটি বেশ বড়। সামনের ঘরে গিয়ে বসার পর আলিজান বললেন, আপনি নিশ্চয়ই পাঠানদের নিয়মকানুন জানেন। আপনাকে বাইরে গিয়ে শৌচ করতে হবে, স্নানের কোন ব্যবস্থা নেই, তবে হাতমুখ ধোবার জন্য গরম জল পাবেন। এখন বলুন কি খাবেন? আমি বললাম, যা আপনারা খান তাই খাব। আলিজান

তৎক্ষণাৎ চা বিস্কুট চিনি-মিশানো নারকেল এবং অন্যান্য শুকনো ফল এনে হাজির করলেন। আমার আগমন উপলক্ষে আলিজানের বাড়িতে আজ গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই আহার করবেন।

আমাদের চা খাওয়া হচ্ছিল এমন সময় আলিজান তাঁর ভাইকে একটি দুম্বা কাটবার জন্য পাঠালেন, আমি সে কথাটা বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। দুম্বা সাধারণত বাড়িতে কাটা হয় না। কোন অতিথি থাকলে হত্যা কাজটি আরও গোপনে করা হয়, যাতে অতিথি মোটেই টের না পায়। এটা হল পাঠানদের নিয়ম বা সভ্যতা। আমাদের দেশে হিন্দুরা পাঁঠা বলি দেয় সকলকে দেখিয়ে, মুসলমানরা ছাগল কাটে উঠানের মাঝে। আফগানিস্থানের সভ্যতা মতে আমরা কোন্ স্তরে পড়ে আছি তা আমরাই বুঝি।

আফগান জাত বড়ই গল্পপ্রিয়, কিন্তু নিজের দেশের গল্প তারা নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে, বিদেশের কথাই শুনতে চায়। তাদের নিয়ম অনুসারেই আমাকেও আমাদের দেশের কথা উহ্য রাখতে হল। গল্প যখন জমে উঠল তখন পোস্ত ভাষায় কথা শুরু হল। আমি যে পোস্ত ভাষা জানি না তারা সে কথা ভুলেই গেল। আমিও এমনি ভান করছিলাম যে তাদের সকল কথাই যেন আমি বুঝতে পারছি। গল্প যখন শেষ হয়ে গেল তখন খাবার তৈরি হয়ে গেছে। গল্পের আসরেই খাবার আনা হল। প্রকাণ্ড একটা থালা ভর্তি পোলাও আর একটা থালাতে দুম্বার মাংস। পাঠানেরা মাংসে বেশি মসলা ব্যবহার করে না। অল্প মসলা থাকায় পোলাও এবং মাংসে মানিয়েছিল ভালই।

আমি ছিলাম প্রধান অতিথি, কাজেই খাদ্য হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়বার কথা আমারই ছিল। কিন্তু আমি মন্ত্র জানি না বলে অন্য একজন

বৃদ্ধ মন্ত্র পাঠ করে খেতে শুরু করার পর অন্যান্য সবাই খেতে লাগলেন। আমিও খেতে লাগলাম। ক্ষুধা বেশ ছিল। সেজন্যই বোধ হয় পাঠানদের সংগে তাল রেখে খেতে সক্ষম হয়েছিলাম। আহারান্তে আবার মন্ত্র পাঠ করা হল, তারপর এল চা। চা পান করে আমি সকলকে বললাম, যদি কেহ কিছু মনে না করেন তবে আলিজান খাঁকে আমি সকলের তরফ হতে ধন্যবাদ দেব। আলিজানকে আমি খাঁ বলায় অনেকেরই যেন মন বিগ্‌ড়ে গেল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না, দুএক জনের সম্মতির জন্য চারদিকে তাকালাম। অবশেষে যিনি মন্ত্র পড়ছিলেন তিনি সম্মতি দিলেন। আমি সকলের পক্ষ থেকে আলিজান খাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্রামার্থ অন্য কামরায় চলে গেলাম। আলিজান সেদিন হতেই বোধ হয় খাঁ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর বংশমর্যাদা ছিল না।

রাত্রে আলিজান আমার জন্য পরিচারক নিযুক্ত করলেন, কিন্তু সেই পরিচারককে আমি বিদায় দিয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লাম। সকাল বেলা উঠেই চলে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আলিজান খাঁ সকালে কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। আলিজান আমার কাছ হতে খাঁ উপাধি পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে বিদায়ের বেলা তিনি কতকগুলি আফগানি মুদ্রা আমাকে পথে খরচ করার জন্য দিলেন।

আলিজান খাঁ-এর গ্রাম পরিত্যাগ করার পর শুরু হল আবার পার্বত্য পথ। রোজ দশ মাইল করে পথ চলা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। কোনদিন পাঁচ মাইল যাবার পরই সেদিনের মত বিশ্রাম নিতে বাধ্য হতে লাগলাম। বিশ্রাম করেছি পথের পাশেই। এতে আরাম পেতুম বেশ। রুটি আমার কাছে মজুত থাকত। পথের পাশে ছোট ছোট ঝরনা হতে জল এনে খেয়ে তৃপ্ত হতাম। কোনরূপ

দ্বিধা না করে পথের পাশেই শুয়ে থাকতাম। এরূপ ভাবে কএক দিন চলার পর শরীর দুর্বল হয়ে গেল। শরীর দুর্বল হলে মনেও আপনা হতেই ভয়ভাবনা দেখা দেয়। মন যখন ভয়ে জড়সড় তখন পথিক নানারূপ বিভীষিকা দেখে। সেই বিভীষিকাই একদিন গল্পে পল্লবিত হয়। আমি সেই বিভীষিকাজাত গল্প হতে রক্ষা পাবার জন্য আফগান জাতের ভালর দিকটাই ভাবতাম। সেজন্যই বোধ হয় আমার মুখ হতে জাতি-বিদ্বেষের হলাহল বের হতে পারে নি।

লোকমুখে শুনলাম অতি কাছেই একটি গ্রাম আছে। প্রতিজ্ঞা করলাম যতদিন শরীর সবল না হয় ততদিন গ্রাম ত্যাগ করে ফের পথে বের হব না। কিন্তু কোথায় গ্রাম, কতদূরে কে জানে। কতদূরে তা মানচিত্রেও নেই। লোকের কথায় যা শুনি তাতেও শান্তি আসে না। "চান্দ মাইল আস্ত" কথাটা বাজে কথাই মনে হতে লাগল। চান্দ মাইল আস্ত-এর অর্থ করে নিলাম গ্রামে পৌছতে আরও কএক মাইল মাত্র বাকি। কিন্তু সকাল বেলাও শুনলাম চান্দ মাইল, বিকালেও তাই, রাত্রি এক প্রহরের পরও সেই একই কথা—চান্দ মাইল আস্ত। ক্রমে এদের কথার উপর অশ্রদ্ধা হল, আর পথের সংবাদ কারো কাছ হতে না নিয়ে পথের পাশেই শুয়ে রাত কাটাতে লাগলাম।

কখনও শুনিনি তন্দ্রার অবস্থায় কারো নাক ডাকে। আমি তখনও গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইনি, অথচ আমার নাক ডাকছিল। নিজের নাক ডাকা নিজেই শুনছিলাম এবং দৃঢ়সংকল্প করেছিলাম, যদি এই ঘুম ভাংগে তবে সর্বপ্রথম কাজ হবে, নোট বইএ এই কথাগুলি লিখে রাখা। লিখেছিলাম বলেই এখানে পুনরাবৃত্তি করতে পারছি।

সত্য কথা বলতে কোন দোষ নেই। যেদিন হতে আমি স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছি সেদিন থেকেই মরণের ভয়ে কখনও ভীত হইনি। তবে স্বপ্নে অনেক সময়ই ভীত হতাম এবং প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেই যেন বাঁচতাম। আজও আমার সেই ভাব এসে পড়েছে। কত রকমের ভূত প্রেত যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। আমি চোখ খুলতে চেষ্টা করছি অথচ চোখ খুলতে পারছি না। অনেক ক্ষণ চেষ্টা করে চোখ খুলে ফেললাম। উঠে বসে পড়লাম। তখনও অন্ধকার ছিল। আশেপাশে কিছুই দেখতে পেলাম না। আমার ধারণা ছিল ভরাপেটে শুলে নাকি নানারূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখা যায়। কিন্তু আমার ভরা পেট ছিল না, খালি পেট ছিল। পরে জেনেছিলাম একেবারে খালিপেট থাকলেও নাকি নানারূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখা যায়।

অন্ধকারে অনেকক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগল না। নিকটস্থ নির্ঝরিণীতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে ফের এসে বসলাম। কতক্ষণ পর হঠাৎ অদূরে মুরগির ডাক শুনে বুঝলাম গ্রাম নিকটেই। আমার আর দেরি সইল না, তৎক্ষণাৎ গ্রামের দিকে পূর্ণ উদ্যমে সাইকেল চালাতে লাগলাম। কতক্ষণ যাবার পরই একটা জলপূর্ণ ছোট নালার ধারে এলাম। নালার ওপারেই একটি সরাই। সরাই হতে হারিকেন ল্যাম্পের আলো আসছিল। সেই আলো আমার মাঝে নবজীবনের সঞ্চার করছিল।

সরাইএর দরজা খোলা। নিকটস্থ কাফিখানারও একটি দরজা খোলা ছিল। কাফিখানাতে কএকজন লোক বসে চা খাচ্ছিল। আমাকেও চা দিতে বললাম। গ্রামের মসজিদে যিনি আজান দেন তিনিও বসে চা খাচ্ছিলেন এবং হাতের মালা টপকাচ্ছিলেন।

মালা টপকানোটা এদেশে বেশ প্রচলিত। মালা টপকানো সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলব না, যদি পারি তবে এ সম্বন্ধে পরে বলব। আমি কোথা হতে এসেছি, কোথায় যাব এবং কি কাজ করি মোল্লা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সংক্ষেপে তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। মোল্লা আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, বলুন তো কখনও ভূত প্রেত এবং জিন দেখেছেন কি না। আমার হাতের ঘড়িটা বাতির কাছে নিয়ে দেখলাম তখন প্রায় পাঁচটা বেজেছে। আমি বললাম, এই দেখুন রাত্র আর মাত্র দেড় ঘণ্টা আছে, আমি আজ একাকী বাইরে ছিলাম, ভূত প্রেত তো দেখিনি। লোকটি আমার কথা পুরা বিশ্বাস করতে পারল না। এদিকে চাএর পেয়ালাগুলি এক এক নিঃশ্বাসে উজাড় করে দিতে লাগলাম। বয় এসে চায়ের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে লাগল। শেষটায় আমি মোল্লাকে বললাম, ভূত প্রেত আমাদের পেটের মাঝে। যখনই আমাদের পেট গরম হয় তখনই আমরা নানারূপ স্বপ্ন দেখি। গত চার বৎসর যাবত আমি দেশ বিদেশে ঘুরছি, অনেক বনে জংগলে রাত কাটিয়েছি, কোথাও তো কোনদিন ভূত প্রেত দেখিনি।

মোল্লা বললেন, ফিরিংগি দাওয়াই বিশ্বাস করেন?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই।

মোল্লা একটা হাই তুলে বললেন, এটা কাফেরির লক্ষণ।

পাশেই একজন লোক তার প্রতিবাদ করে বললে, ফিরিংগি দাওয়াই না হলে আমাদের চলে না। হেকিমি দাওয়াই তো কোন কাজেই লাগে না। ইংরেজের সংগে যখন লড়াই হয়েছিল, তখন ফিরিংগি দাওয়াই না পেলে অনেক আহত সেপাইই মরে যেত।

মোল্লা একদম চুপ। তাঁর দুরবস্থা দেখে আমার বড়ই দুঃখ হল,

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, না বুঝে কোন কিছুর বিরুদ্ধে চটপট মত প্রকাশ করা আপনাদের মত ভগবানবিশ্বাসীর পক্ষে অন্যায়। আপনারা চান দুনিয়ার ভাল হোক, বিষ খেয়েও যদি দুনিয়ার ভালই হয় তাতে ক্ষতি কি?

মোল্লার একটু শান্তি হল। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্য অনুরোধ করলেন, আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁর অনুসরণ করলাম।

সাত

মোল্লার বাড়ি মসজিদ হতে সামান্য দূরে। বাড়িতে পৌঁছে তিনি অন্দরে প্রবেশ করলেন আর আমি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। বাড়িটি ছোটখাট একটি দুর্গবিশেষ। এ ধরনের বাড়িঘর তৈরি হয় যেখানে বন্য জীবের অত্যাচার প্রচুর। আফগানিস্থানের উত্তর দিকটাতে নেকড়ে বাঘ ভয়ানক অত্যাচার করে থাকে। প্রত্যেক পাঠানের ঘরে বন্দুক পিস্তল এমন কি মেশিনগান পর্যন্ত থাকে, তবুও দল বেধে যখন নেকড়েরা আক্রমণ করে তখন বন্দুক-কামানে কিছুই হয় না। তখন ওদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হয়, নতুবা রক্ষা নেই।

পাঠানদের মাঝে একটা প্রচলিত কথা আছে, যদি বাঁচতে হয় তবে মরণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবেই, লড়াই করতে হবেই, বৈদেশিক শত্রুকে রুখতে হবেই। যদি বাঁচতেই হয় এবং লড়াই করতেই হয় তবে নেকড়ে বাঘের মতই লড়তে হবে। মরণকে কোন মতেই ভয় করলে চলবে না। কথাটা যখন শুনেছিলাম তখন মনে হয়েছিল নিজের দেশের কথা। আমাদের প্রাণের মায়া অদ্ভুত, আমরা মরতে

জানি না, বাঁচতেও জানি না। আমরা আমাদের ভবিষ্যত ভগবানের ওপর ছেড়ে দিই। পাঠানরা আল্লাকে মানে, আল্লার নামে ভয়ও পায়, কিন্তু তা বলে নিজের দেশকে, নিজের মা-বোনকে রক্ষা করার বেলা আল্লার ওপর সব ছেড়ে দেয় না। তারা বিপদের সময় "পরমাল"-স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণও দেয় পতংগের মত। একজন পাঠানকে বলেছিলাম মরণের সংগে পরমালের উপমা দেওয়াটা উচিত হয়নি। পাঠান তেড়ে বললে, যখন মরতে যাব তখন যদি অন্য ভাব থাকে তবে পরাজয় অনিবার্য। শূকর যখন আক্রমণ করে তখন মরণের ভয় রাখে না। এসব কথা শোভা পায় তাদেরই যারা মরণকে যে কোন মুহূর্তে আমন্ত্রণ করতে পারে।

দাঁড়িয়ে পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তুলছিলাম আর দেখছিলাম মোল্লার বাড়িটা। আধ ঘণ্টার মাঝেই মোল্লা ফিরে এলেন এবং আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। বাড়িতে অনেকগুলি কামরা। সামনের দিকের একটি কামরায় আমরা প্রবেশ করলাম। মোল্লা আমাকে সুসজ্জিত বিছানা দেখিয়ে বললেন, এতে শোবেন এবং অন্যান্য দরকারি কাজ হলে বাইরে যাবেন। চারপাইএর কাছেই একটি সন্দলও ছিল। আমি সন্দলের কাছে না বসে চারপাইএর ওপর গিয়ে বসলাম এবং লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বেলা দশটায় সময় আমার নিদ্রা ভংগ হল। চটপট প্রাতঃকৃত্য শেষ করে ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে আবার খাটে এসে বসলাম এবং আরাম করে আর একটা সিগারেট ধরালাম। ইত্যবসরে মোল্লা কএকজন ছাত্রকে নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি সবাইকে নমস্কার করলাম। তাঁরা বিনিময়ে আদাব করলেন। এখানে আরেমশে শব্দের খুব কম ব্যবহারই দেখলাম। ছাত্রদের মাঝে

একজন হিন্দুও ছিলেন। তার মাথায় ছিল বোখারার কেপ। অন্যান্যদের মাথায় ছিল পাগড়ি। ছোট ছোট মাসাদি কাপড়ের পাগড়িগুলি দেখাচ্ছিল বেশ। যে কজন যুবক এসেছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই শরীর নিখুঁত এবং নীরোগ। এরূপ নিখুঁত এবং নীরোগ দেহ আফগানিস্থানে কমই দেখা যায়। তাদের আকৃতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। তারা ছিলেন গম্ভীর এবং স্বল্পভাষী। তাদের মুখের ওপর চিন্তার দাগ পড়েছিল। চিন্তিত মুখের ভংগিই অনুরূপ। চিন্তারেখাযুক্ত মুখ আমার কাছে প্রিয়। আমি সেই প্রিয়দর্শন মুখগুলি নয়নভরে দেখছিলাম। মোল্লা তাদের প্রত্যেককে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর নিজের ছেলেটিও বাদ পড়েনি। তাঁরা প্রত্যেকেই মেডিকেল স্কুলের ছাত্র।

আলাপ পরিচয় হবার পর আমরা সকলেই দুখানা করে পরোটা এবং চা খেলাম। তারপর কথা আরম্ভ হল। কিন্তু কথা বলতে আমার ভাল লাগছিল না। সিগারেট আমার ফুরিয়ে গিয়েছিল, সিগারেট না হলে যেন কি একটা অভাব অনুভব হয়। একজন ছাত্র আমার অবস্থাটা বুঝে নিকটস্থ একটা দোকান হতে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিলেন, আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধাতে ফিরে এলাম।

এখানেও আমিনা এবং মামুদের গল্পের পুনরাবৃত্তি হল। তারপর শুরু হল চীনের ডাকাতদের (কমিউনিস্ট) কথা। চীনের কমিউনিস্টরা ডাকাত বলেই সর্বপ্রথম সুখ্যাতি লাভ করেছিল। আমান উল্লা এবং বাচ্চা-ই-সাক্কোর কথা কেউ বললেন না দেখে আমিই তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলাম। সকলেই আমান উল্লার ছবি মন হতে মুছে ফেলেছে, কিন্তু অনেকে এখনও বাচ্চা-ই-সাক্কোর কথা ভুলেনি। বাচ্চা-ই-সাক্কো

সম্বন্ধে এখানে একটি নূতন গল্প শুনলাম, যা হিরাতের কথার সংগে সংযুক্ত রয়েছে। অতএব হিরাতের ভ্রমণ কথায়ই তা বলা হবে।

মোল্লার বাড়িতে চারদিন কাটিয়ে মোল্লার পুত্র ইয়াকুবকে সংগে নিয়ে আমি চললাম কাবুলের দিকে। ইয়াকুবের বয়স মাত্র একুশ। এরই মাঝে সে ফারসি এবং হিন্দুস্থানি ভাষা বেশ দখল করে ফেলেছে। পূর্বেই বলেছি এরা সবাই নিখুঁত এবং সবল যুবক। এই যুবকের আমার সংগ নেবার কারণ একটু পরই বলব।

পঞ্চম দিন সকাল বেলা আমরা গ্রাম ছেড়ে বড় পথে এলাম। আমি আগে আর ইয়াকুব পেছনে। প্রায় মাইল দশেক চলার পর ইয়াকুব বললে সে একটু বিশ্রাম করবে। আমি তাতে রাজি হলাম এবং উভয়ে একটা পাথরের আড়ালে বসলাম। আমাদের সংগে রুটি এবং মুরগির তরকারি ছিল। উভয়ে বেশ করে খেয়ে নিয়ে কথা শুরু করলাম। ইয়াকুব বললে, সে মামুদের মত হয়ে পরিশ্রম করবে, সে যে মধ্যবিত্তের ছেলে সে-কথা ভুলে গিয়ে সে মজুরের কাজ করে অত্যাচারিত হবে, তারপর আফগানিস্থানকে বোখারায় পরিণত করবে। আমি নীরব, শুধু তার কথা শুনে যেতে লাগলাম। সে ফের বলতে লাগল, পথেই আমি বুঝতে পারব মেডিকেল ছাত্রেরা কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। আমি তাকে বললাম, যখন তুমি অত্যাচারিত হবে তখন আমি চুপ করে থাকব না, বাধা দেব। তাতে যদি আমার আফগানিস্থান ভ্রমণ না হয়, না হবে, বেলুচিস্থান হয়ে ইরান যাব। পাঠান জাত বড়ই ভাবপ্রবণ, আমার সামান্য মুখের কথায়ই সে চুপ হয়ে গেল। আমরা আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার অগ্রসর হতে লাগলাম।

একটু যাবার পর পাশেই একটি কবর পড়ল। ইয়াকুব সাইকেল

থেকে নেমে কবরে গিয়ে প্রার্থনা করে এসে বললে, কি প্রার্থনা করেছি জানেন ?

—বল কি বলেছ। বলেই তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে মাথা নত করে বললে, শেষের দিনে যেন ভগবান এই পবিত্র ইসলাম আত্মার সদ্গতি করেন।

—বুঝেছি হে, আমি এখানে যদি মরি তবে আমার আত্মার জন্ম সেরূপ প্রার্থনা করবে না, যেহেতু আমি ইসলাম ধর্মের নই।

সে একটু হেসে বললে, আমাদের দেশের লোকের ধারণা কিরূপ তা বুঝাবার জন্যই এরূপ বললাম, এসব কথা মনে রাখবেন না। এগিয়ে চলুন, আজ আমাদের একটা ছোট গ্রামে পৌছার কথা আছে, সেখানে গিয়ে আপনি যেমন লেকচার দেবেন আমিও সেরূপ লেকচার দেব।

পাহাড়ের গায়ে গ্রাম। গ্রামটি ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার বলেই মনে হল। আমরা কিন্তু একটা আবর্জনাপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করলাম, যেন ভারতের একটা গোয়াল ঘর। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগল। ঘরটা দিনের বেলায়ও অন্ধকার। এরূপ ঘরে আমার একতিল সময়ও থাকতে ইচ্ছা হয়নি, শুধু ইয়াকুবের অনুরোধেই বসতে হয়েছিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তিনটি প্রৌঢ় লোক ইয়াকুবকে ঘিরে দাঁড়াল। ইয়াকুব প্রত্যেকের সংগে করমর্দন করল, আলিংগন করল না। আমিও করমর্দনই করলাম। আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একটি লোক ঘরের মাঝে আগুন জ্বালল এবং আমাদের বসবার জন্য একটা পঁচা কাঁথার মত একটা কারপেট দেখিয়ে দিল। আমরা তাতেই বসলাম। অল্প সময়ের মাঝেই চা তৈরি হল। আমাদের চা খেতে দিয়ে তিনটি লোকই গ্রামে গেল, আমরা দুজনায় কথা বলতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ কথা বলে বুঝলাম, প্রগতিশীল যুবকগণ করমর্দনই করে, আলিংগন করে না। এবং যদি কেউ পূর্বপ্রথাকে সম্মান দেখাতে বলে তবে তারা বিনা তর্কে এমনই একটা ভংগি করে যে কেউ আর তাদের আলিংগনের জন্য অনুরোধ করে না।

আফগান জাত নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত তা পূর্বেই বলেছি। ইয়াকুব সেই শ্রেণীগুলি ডিংগিয়ে আর এক স্তরে উঠেছে। তার নাকে নর্ডিক ছাপ রয়েছে, চোখ কটা, চুল পিংলা। তা বলে সে কখনও আমার কাছে নিজকে আর্য বলে পরিচয় দেয়নি। সাধারণত আফগানিস্থানে দ্রাবিড়, আর্য, মোংগল এবং সেমেটিকদের মাঝে বিবাহ চলে কিন্তু মোংগলরা এই তিন শ্রেণীর লোকেদের সাথে বৈবাহিক আদান-প্রদান করে না, কারণ মোংগলরা প্রায়ই শিয়া। শিয়া এবং সুন্নিতে কেন বিয়ে হয় না সে কথা আমি জানতে চেষ্টা করিনি। যে তিনটি লোক গ্রামে চলে গিয়েছিল তারা মোংগল নয়, যে লোকটি চা এবং রান্নার বন্দোবস্ত করছিল সে মোংগল। সে আলির ভক্ত, মোহম্মদের নাম সে নেয় না। কিন্তু এই দুর্গন্ধযুক্ত ঘরে মোংগল এবং অমোংগলের একত্র সমাবেশ দেখেই আমার সন্দেহ হল, এরা নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক দলের লোক। ইয়াকুবকে এ সম্বন্ধে কিছুই বললাম না। গির্দাতে বসে হাত দুটা ছড়িয়ে দিয়ে ওপর দিকে চেয়ে রইলাম। লোক তিন জন ফিরে আসার পর রান্নার বন্দোবস্ত হল। পাঠানদের পাক প্রণালী আমাদেরই মত। একদম সাদাসিধা। দোকানের নান (চাপাত্তি) আর নুন লাগানো টুকরা মাংস। মাংসগুলিকে একটা লোহার শিকে গেঁথে নেওয়া হল। চায়ের সকল বন্দোবস্তই ছিল। আমাদের খাওয়া এবং হাতমুখ ধুয়ে বসতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না।

পাঠানরা বড়ই গল্পপ্রিয় একথা আগেই বলেছি। আমি গল্প শুরু করিনি, তারাই শুরু করল। আমি শ্রোতা। ইরানি ভাষায় তারা কথা বলছিল, কারণ মোংগল লোকটি পারতপক্ষে পোস্তু ভাষায় কথা বলে না। এদের কথার মাঝে মাঝে ইন্‌ক্লাব শব্দটি আমি বার বার উচ্চারিত হতে শুনে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ লাহোরে একটি সংবাদপত্রের নাম ছিল ইন্‌ক্লাব, সেই সংবাদপত্রটির কাজই ছিল নাকি সাম্প্রদায়িক বিভেদ জাগিয়ে রাখা। ভাবলাম হয়তো এদের মাঝে আমাকে নিয়ে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। তখনও আমি ইন্‌ক্লাব শব্দের অর্থ কি জানতাম না। ইয়াকুবকে বললাম, আমার ধর্ম নিয়ে যদি ওরা কোন প্রশ্ন উঠিয়ে থাকে তবে বলে দাও আমি তোমার সংগ এখনই পরিত্যাগ করে বাইরে গিয়ে শোব, আমার সে অভ্যাস আছে। ইয়াকুব আমার কথা শুনে যেন আশমান হতে পড়ল, সে জিজ্ঞাসা করলে, একথাটার মানে? আমি বললাম, এরা বার বার ইন্‌ক্লাব কথাটা বলছে। লাহোরে একটা সাপ্তাহিক কাগজ আছে যার নাম ইন্‌ক্লাব, সেই কাগজের কাজই হল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কথা বলা। আমার ভয় হচ্ছে এখানেও সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এসে প্রবেশ করেছে।

ইয়াকুব আমাকে বললে, ইন্‌ক্লাব মানে কি জানেন?

আমি বললাম, ইন্‌ক্লাব মানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো বলেই মনে হয়।

ইয়াকুব হেসে বললে, আপনাদের দেশে ইন্‌ক্লাব মানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হতে পারে, কিন্তু এদেশে শব্দটার অর্থ বিদ্রোহ। যাকগে চুপ করে থাকুন, এ কথাটি কখনও মুখে আনবেন না।

তখন ভাবলাম স্থানভেদে শব্দেরও বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে।

লাহোরের ইনক্লাব সাপ্তাহিক আরবি অক্ষরে ছাপা হত, অতএব তাতে বিদ্রোহ প্রচার করা হত কি সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাগিয়ে রাখা হত তা আমি ঠিক করে বলতে পারি না, তবে আমাকে অনেকেই বলেছিল এই কাগজখানা আর্যসমাজীদের উল্টো কথাই বলে।

ইয়াকুব এবং অপর চারজন লোক অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলে আমার মুখের দিকে তাকাল এবং খুব চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলে, তুম কাবুল যাওগে? আমি বললাম, সেরূপই তো ইচ্ছা। মোংগল লোকটা বললে, হুঁশিয়ার হো কে বাত করো, ইনক্লাব কা মতলব মালুম নেই আউর মুসাফির বলকে জাহির করতা হ্যায়, সরম নেই হোতা? মনে মনে বললাম, জাহান্নামে যাক তোমার ইনক্লাব, যেরূপ ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে প্রাণ বাঁচানই দায়। মুখে বললাম, একটু আগুন ধরাও না মোল্লা সাহেব, আমার শরীর যে কাঁপছে। আমার কথা শুনে সবাই এক সংগে হেসে উঠল।

দুর্গন্ধযুক্ত স্থানটাতে কোন মতে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে সকলের সংগে করমর্দন করে বিদায় নিলাম। ইয়াকুব পথে এসে মুখ খুললে, আমি মুখ বন্ধ করলাম। আমি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে চললাম আর ইয়াকুব বকে বকে চলল। শেষটায় সে বললে, পাহাড়টার গায়ে আপনি কি দেখছেন?

—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছি হে?

চট করে ইয়াকুব বললে, এই পাহাড়ে কত ধাতব পদার্থ আছে সে কথা চিন্তা করুন, দেখবেন এই পাহাড়গুলিকে দেখে মনে মনে কত সুন্দর গ্রামের সৃষ্টি করতে পারবেন। আপনারা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়েই মশগুল, এতে কি কোন লাভ আছে? যাকগে, এখন জোরসে চলা যাক।

দ্বিপ্রহরে আমরা একটি ফেরিওয়ালাকে পথে পেলাম, সে গ্রামান্তরে যাচ্ছে। তার কাছ থেকে গোস্তরুটি কিনে নিয়ে আমরা খেলাম। এরূপ ফেরিওয়ালা আর কোথাও দেখিনি। এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে গিয়ে ফেরি করে জিনিস বিক্রি করা দেখা তো যায়ই না, এবং সম্ভবও নয়। কারণ গ্রামগুলি অনেক দূরে দূরে। তবে এই ফেরিওয়ালা কে? পরে জেনেছিলাম এই লোকটি ফেরিওয়ালা নয়, ইয়াকুবেরই একটি আত্মীয়, পূর্বে সংবাদ পেয়ে আমাদের জন্য খাদ্য নিয়ে এসেছিল। তবে গোস্তরুটির দাম নিলে কেন? বোধ হয় আমি যাতে চিনতে না পারি এইই ছিল তার উদ্দেশ্য। খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম করবার জন্য আমরা একটি স্থান বেছে নিলাম।

স্থানটি পরিষ্কার এবং পাহাড়ের আড়ালে। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ, তারপরই আর একটা পর্বত অন্য একটা পর্বতমালার উপর কালো ছায়া ফেলে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল, যেন বাদামী রঙের মেয়েটি পবিত্র সনাতনী ধরনে ভাসুর ঠাকুরকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দিচ্ছিল। পর্বত, তুমি বাস্তবিকই রমণী, কারণ তোমার মায়া বোঝা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। কোথাও তুমি অপরূপ সৌন্দর্যে সজ্জিত হয়ে ভাবপ্রবণ প্রণয়ীকে কাছে ডেকে নিয়েছ কিন্তু এমন পদাঘাত করছে যে বেচারি প্রণয়ীর হাড় পর্যন্ত ভেংগে শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে। যখন তোমাকে আমি ডিংগিয়ে পার হই তখন আমার চোখ ফেটে রক্ত বের হতে চায়, মনে হয় তোমার সংগে সম্বন্ধ রহিত করলেই বুঝি প্রাণে প্রাণ ফিরে আসে। তোমার প্রেমের স্বরূপ আমি কতকটা বুঝেছি।

ভাবপ্রবণ হয়ে চিন্তা করলে বাস্তব ভুলে যেতে হয়। বাস্তব হল পাহাড়-পর্বত পাথরের ঢিবিমাত্র। ইয়াকুব এরই মাঝে শুয়ে পড়েছিল।

এরূপ পরিশ্রম সে কখনও করেনি তাই ঘুম তার চোখে লেগেই ছিল। আমরা আরও দুটা দিন বাইরে কাটিয়ে কাবুলের সন্নিকটে এলাম। আমার আনন্দ হচ্ছিল কাবুল দেখব বলে, আর ইয়াকুবের গলা শুকাচ্ছিল কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে বলে। ইয়াকুবের মুখ এবার সত্যিই শুকিয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কষ্ট হচ্ছে কি বন্ধু? ইয়াকুব বললে, তার কষ্ট হয়নি তবে আর একটু এগিয়ে গেলেই ঘাঁটি আসবে, সেখানে তাকে বলতে হবে কেন সে কাবুল যাচ্ছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে সে পাচ্ছে না। আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, তুমি বলবে, কাফেরটাকে অনুসরণ করে চলেছ এবং দেখছ সে ইসলামের কোন ক্ষতি করছে কি না। যুবক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কতক্ষণ যাবার পরই আমরা একটা ঘাঁটিতে পৌঁছলাম। ঘাঁটিতে কোন সেপাই নেই, মুফতির পোশাক পরে একজন অফিসার বসে ছিলেন। আমি এসেই পাসপোর্টখানা তাঁর হাতে দেবার পর ইংগিতে তিনি আমাকে ঘাঁটি পার হবার আদেশ দিলেন। হন্ হন্ করে চলে গিয়ে আমি একটু দূরে ইয়াকুবের অপেক্ষায় বসলাম। এদিকে ইয়াকুব এসেই চোখ মুখ লাল করে কাস্টম অফিসারকে কি বললে এবং কাস্টম পার হয়ে চলে এল।

আমি তখনও বসা। সে আমাকে বসা অবস্থায় রেখেই এগিয়ে চলে গেল, যেন সে আমাকে চেনেও না। কতক্ষণ যাবার পর উভয়ে একত্র হলাম। ইয়াকুব বললে, আমার উপদেশে বেশ কাজ হয়েছে।

আমরা সেদিন আর বেশি দূর না গিয়ে একটি সাবেকি গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলাম। গৃহস্থও আমাদের মামুলি ভাবেই গ্রহণ করল। রাত্রে খাবারের জন্য আমরা প্রত্যেকে মাত্র দুখানা করে রুটি পেলাম। দরিদ্র গৃহস্থ একটু তরকারিও দিতে সক্ষম হয়নি। আমি বারবার

ইয়াকুবকে ইংগিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম, গৃহস্থ যেন কোন মতেই আমাদের একে অন্যের অন্তরংগত্ব বুঝতে না পারে। ঘুমাবার বেলাও দুজন দুদিকে ঘুমালাম, মাঝে শুল গৃহস্বামী। গৃহস্বামী আমাকে যা খেতে দিয়েছিল, ইয়াকুব তার একটুও বেশি পায়নি। ইয়াকুব ইসলাম-রক্ষকরূপে ঘরে প্রবেশ করেছিল এবং আমার নামে নানা রকম বদনাম করছিল। কিন্তু গৃহস্থ উভয়কেই মুসাফির ভেবে সমান ব্যবহারই করেছিল।

প্রথম ঘাঁটিটি হল পূর্বকথিত দু নম্বর কাবুল। এ স্থানটার সম্বন্ধেই নানারূপ উপকথা আছে। এই স্থানটি সমতল এবং জলেরও সুবিধা আছে। লড়াইএর সময় জল বিষাক্ত করে দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা নেই। এজন্যই বোধ হয় বৈদেশিক আক্রমণ-কারীরা পূর্বে এসব স্থানেই তাঁবু ফেলতেন। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই কারকাড়গ পর্বতমালাতে লুক্কায়িত পাঠানদের অস্তিত্ব কি করে যে তারা অনুমানও করতে পারেনি তা আমার মাথায় আসে না। হরিসিং লিলুয়া এবং কএকজন রাজপুতই এখানে এসে শুধু তাঁবুই ফেলেননি। তারা প্রত্যেকেই দুই নম্বর কাবুলকে বাঁয়ে রেখে আরও উজানে গিয়ে, পেছন দিক হতে আসল কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। কাবুলে যত আক্রমণকারীই এসেছিলেন, কারো নাম ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু হরিসিং লিলুয়ার নাম আজও শিশুদের ঘুম পাড়াবার মন্ত্র হয়ে রয়েছে। হরিসিং লিলুয়া কখনও সমতল ভূমিতে কোনরূপ আস্তানা গাড়েননি, দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়ায় তিনি নতুন নতুন দুর্গ গঠন করে তাতেই শিখ সেপাইদের থাকবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। আজও সেই দুর্গমালা বর্তমান। বৃটিশও হরিসিং লিলুয়ার অনুকরণ করে কাবুলের কাছেই একটা দুর্গ তৈরি করেছিলেন,

আজ সেই দুর্গ খালি পড়ে আছে, হয়তো একখানা ঘরও তাতে নেই, শুধু চারদিকে দেওয়ালটাই দেখতে পাওয়া যায়। আমি কষ্ট করে সেই পুরাতন দুর্গ দেখতে যাইনি। দুর্গ দুর্গ ই, শাসিত এবং শাসকের মাঝে একটা পর্দা মাত্র। যখনই শাসকের শক্তি ক্ষয় হয় তখনই দুর্গের দেওয়াল থাকে, ঘর তথায় থাকে না।

সকালে উঠেই আবার আমরা পথে এলাম। পথ দুর্গম নয় তবে উল্টা বাতাস শুরু হয়েছিল। উল্টা বাতাসে চলা ভয়ানক কষ্টকর। সেজন্য আমরা একটা ঘরের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ইয়াকুব আমার ঘুমে বাধা দেয়নি। সে আমার সংগ পছন্দ করছিল এবং কাবুলে যত দেরি করে পৌছতে পারি তারই উপায় খুঁজছিল। প্রায় তিনটার সময় যখন ঘুম ভাংল তখন ইয়াকুব বললে, আজ এখানেই থাকা যাক, আমি রুটি নিয়ে আসছি। আমি তাতে রাজি হলাম এবং রুটি খেয়ে ইয়াকুবকে বললাম, যে-সমাজে আমি জন্মেছি তার নিয়মকানুন এত ধ্বংসকরী যে তার সংশোধন অসম্ভব, পালটে নতুন করে গড়া যেতে পারে।

ইয়াকুব কখনও ভারতবর্ষে আসেনি, আসবার তার ইচ্ছাও নেই। সে ভারতবর্ষ না দেখে দেখতে চায় রুশ দেশ এবং উত্তর চীন। চীনের সংবাদ পাবার জন্য তার ভারি আগ্রহ। কথায় কথায় বললাম, কুসংস্কারের দিক দিয়ে এবং খাদ্যের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের সংগে পাঠানদের বেশ মিল রয়েছে। তন্ত্রমন্ত্র ভূতপ্রেত পাঠানদের ঘাড়ে যেমন চেপে বসেছে, ভারতবাসীর ঘাড়েও তেমনি। পাঠানরা ডাল রুটি তরকারি অথবা ডাল ভাতই খেয়ে থাকে, ভারতবাসীরাও তাই খায়। পৃথিবীর অনেক স্থানে গিয়েছি, সর্বত্র দেখেছি ভারতবাসী এবং পাঠান একত্রে বসবাস করে। আমেরিকায় পাঠানরা নিজদের

হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং দাবি করে তারাই আসল এবং পবিত্র হিন্দু। বাংগালী মুসলমানকে পাঠানরা কোনদিনই হিন্দু বলে স্বীকার করত না, এখনও করে না। সেজন্য ডিট্রয় শহরে পাঠান এবং পাঞ্জাবী মুসলমান মিলে গড়েছে হিন্দু সভা, আর অন্যান্য ভারতবাসী মিলে গড়েছে ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন। পাঠানরা হেসে আমেরিকানদের বলে, আমাদের দেশেও ইণ্ডিয়ান আছে, ঐ দেখ তাদের এসোসিয়েসন। ডিট্রয় যাবার পর আমি ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন উঠিয়ে দিয়ে হিন্দু এসোসিয়েসন নাম দেবার জন্য বলায় অনেকেই আমার প্রতি রাগ করেছিল। তার একমাত্র কারণ পাঠানদের সংগে বাংগালী মুসলমানদের মনের মিল নেই। অথচ প্রত্যেকেই নিজেদের খাঁটি হিন্দু বলে প্রমাণ করতে চায়।

আমরা যে স্থানে বিশ্রাম করছিলাম তার একদিকে একটি পুরাতন ঘর আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। কিন্তু মাঠ খালি। শীত সমাগত। শীত সত্বরই শুরু হবে সেজন্য শীতের হিমেল বায়ু পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দিকেও ধেয়ে আসছিল।

রাত্রি যখন গভীর তখন একদল পুলিশ সেদিকে যাচ্ছিল। পুলিশ দেখেই ইয়াকুব পলায়ন করল, আমি একাকী শুয়ে রইলাম। পুলিশ আমাকে একাকী দেখে সাহসী বলে একটু প্রশংসা করে নিজেদের পথে চলে গেল। ইয়াকুব ফিরে এসে বললে, খুব বেঁচে গেছি। এরা যদি আমাকে তোমার সংগে দেখত তবে আর রক্ষা ছিল না, নিশ্চয়ই কারাগারে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেতে হত।

আফগানিস্থানের জেলে খাদ্যের সুবন্দোবস্ত নেই। ওয়ার্ডার বলে যদি কিছু থাকে তবে আছেন জেইলারই, আর কেহ নয়। এখনও আফগান কারাগার আদিম যুগোচিতই রয়েছে। অনেক কারাগারে

খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। বার থেকে কয়েদীকেই খাদ্য যোগাড় করে আনতে হয়। ডাণ্ডা বেড়ি পায়ে সেজন্য অনেক কয়েদীকে পথে ঘাটে দেখা যায়। তবে যদি বর্তমানে কারাগারের পুরাতন নিয়ম উঠে গিয়ে নতুন কিছু হয়ে থাকে তবে ভালই। আমি কাবুলে থাকার সময়ই আব্দুল্লা আমাকে বলেছিলেন যে আফগানিস্থানে অনেক আইনকানুন সত্বরই রদবদল হবে। আমি তাঁকে শুভস্য শীঘ্রং করতে বলেছিলাম। তিনি হেসে বলেছিলেন, এদেশের কারাগারে আপনার আগমনের সম্ভাবনা আছে নাকি? আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার শত্রুও যেন এরূপ কষ্টে পতিত না হয়।

রাত্রি আমাদের কাটল সুখেই। পরদিন আমরা ফের রওয়ানা হলাম এবং দুটি কাস্টম হাউস পার হয়ে কাবুল শহরে পৌছলাম। কাবুল শহরে পৌছবার পূর্বে ইয়াকুবের সংগে কথা হল, যদি আমি কান্দাহারে মোটরে করে যাই তবে সেও যাবে এবং পারতপক্ষে উভয়ে একত্রে থাকব। কিন্তু কাবুলে পৌছেই ইয়াকুব অন্যত্র চলে গেল, কারণ তার গতিবিধি পুলিশ পছন্দ করছিল না। ইয়াকুব নাছোড়-বান্দা ছেলে, কান্দাহারে ফের সে আমার সংগে হিরাত যাবে বলে মিলিত হয়েছিল। সে সব কথা পরে হবে।

কাবুল

এক

কাবুল হোটেলের কাছে এসে সাইকেল হতে নেমে কাবুল শহর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। এক দিকে পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড একটা দুর্গ খালি পড়ে রয়েছে। এই দুর্গটি বৃটিশ সরকার তৈরী করেছিলেন কাবুলের উপর খবরদারি করার জন্যে। দুর্গটির গড়ন দেখে ভারতের সেকেন্দ্রাবাদের কথা মনে পড়ল। কোথাও দুর্গ তৈরী করা হয়, আর কোথাও করা হয় ছাউনী। উদ্দেশ্য একই। অপর দিকে উচ্চ পর্বতমালা সহস্র ঢেউ খেলে নিশ্চয়ই ভারতের দিকে কোথাও এসে লয় পেয়েছে। অন্য দুদিকে সমতল ভূমি।

কাবুল সমতল ভূমির উপর অবস্থিত নয়। কাবুল ক্রমেই পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। কাবুলীরা সমতল ভূমি পছন্দ করে না, সেজন্যই বোধ হয় শহরের পরিসর ক্রমে উঁচু হতে আরও উঁচুর দিকে চলেছে।

কাবুল পুরাতন শহর। শুধু পুরাতন বললেই হবে না। মোগল পাঠানের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা বৌদ্ধযুগের কথা বলি তবুও কুলাবে না। আর্য সভ্যতার কথা পেছনে রেখে আরও একটু যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখতে পাওয়া যায় দ্রাবিড় জাতের ঐতিহাসিক নিদর্শন। সে নিদর্শন এখনও এই শহরের বহু স্থানে বর্তমান রয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, বহু পুরাতন শিবমন্দিরগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে পুরাতনের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেবার জন্য। আফগানিস্থান

একদিন যে ঐতিহাসিকদের মক্কা হয়ে দাঁড়াবে তা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে সময় কখন আসবে তা আমি বিশেষভাবে বলতে সক্ষম নই, তবে সে সময় বেশি দূরে নয়। আজ পুরাতত্ত্ববিদরা সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি শহরের পুরাতন কথা নতুন করে জনসমাজের কাছে ধরে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আর জনসমাজ সেই পুরাতন কথাও নতুন করে ভাবতে সক্ষম হচ্ছে।

কাবুল দাঁড়িয়ে আছে অতীতের ঐতিহাসিক ধূলিকণার ওপর। আমি ঐতিহাসিক নই। আমি শুধু জানি আমান উল্লা হতে জাহির শাহের আমলের কথা মাত্র। বর্তমান আফগানিস্থানের কথা যতটুকু জেনেছি তাই এই পুস্তকে বলতে চেষ্টা করছি মাত্র।

কাবুল ছোট শহর। চার ঘণ্টা সাইকেলে বেড়ালে সমুদয় শহর, মায় তার অলিগলি পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যায়। শহরের লোকসংখ্যা কত হবে তা আমি জানবার চেষ্টা করিনি। তবে আমাদের দেশের শহরগুলিতে পতংগের মত যেমন মানুষ পথেঘাটে দেখতে পাওয়া যায়, কাবুলে সেরূপ কখনও দেখিনি, এমন কি ঈদের দিনেও নয়।

পথে চলবার সময় আমাকে যেমন সবাই দেখছিল, আমিও তেমনি পথচারীদের লক্ষ্য করেই পথ চলছিলাম। পথে নানারূপ লোকই দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু মোংগল জাতীয় কএকটি লোককে দীন-দরিদ্র বেশে গাধার পিঠে জ্বালানী কাঠ বোঝাই করে বিক্রয়ার্থ বাজারে যেতে দেখে মনে বেশ কৌতূহল জেগেছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, পথের মাঝে এরা কোনরূপ চিৎকার করে না। বাড়ি হতে যদি কেউ ওদের দেখে জ্বালানী কাঠ ক্রয় করার জন্য ডাকে তবেই তারা দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হয়, নতুবা সোজা জ্বালানী কাঠের বাজারে গিয়ে এক সংগে সমুদয় কাঠ বিক্রি করে আসে। পথের মাঝে আর এক

শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় তারা হল ইহুদী। ইহুদীরা পথের কাছে দাঁড়িয়ে জুতা বুরুশ করে এবং ছুরি শান দেয়। মনে হল এই দুটি কাজ করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া আরও অনেক ধরনের লোক পথে দেখলাম। তবে ইউরোপীয়দের গতিবিধি খুব কমই দেখতে পেলাম। পথে অনেক ভিখিরিও চলেছিল। তারা কিন্তু আমাদের দেশের ভিখিরির মত পথিককে বিরক্ত করে না। কেউ যদি দয়া করে কিছু দেয় তাই তারা হাত পেতে নেয়।

কাবুলের কালী-মন্দিরেই প্রথম যাব স্থির করেছিলাম। কালী-মন্দিরে যাবার একমাত্র কারণ হল, সেখানে নাকি একটা সরাই বা ধর্মশালা ছিল। ভেবেছিলাম ধর্মশালাতেই গিয়ে কএকদিন থাকি, তারপর টাকাকড়ি হলে হোটেলে যাব। পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে কালী-বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়ে দরজার কড়া নাড়লাম। কএকবার কড়া নাড়তেই পূজারী দরজা খুলে দিলেন। লোকটিকে দেখে মনে হল তিনি মন্দিরে হয়তো কোন কারণে এসেছেন, পূজারী অন্য লোক হবেন। লোকটির পোশাক মামুলী ধরনের পাঠানদের মতই ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে কিন্তু জানলাম তিনিই পূজারী। তখন আমিও তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। মুসাফিরখানার কথা জিজ্ঞাসা করতে জানলাম, এখানে পৃথক ভাবে কোন ধর্মশালা নেই। পূজারী মন্দিরসংলগ্ন একটা ঘর আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন যে, অতিথি কেউ এলে ঐ ঘরটাতেই যায়গা করে দেওয়া হয়। সারাদিন সাইকেল চালিয়ে বড়ই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, নতুন করে আস্তানা খোঁজার তখন আর উৎসাহ মোটেই ছিল না। কাজেই পূজারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম না।

পূজারী আমাকে দাঁড় করে রেখেই ঘরে চলে গেলেন। আমি

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘরের গড়ন, মন্দিরের ত , এসব ভাল করে দেখতে লাগলাম। কতক্ষণ পর পূজারী ফিরে এসে আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি ঘরে গিয়ে প্রজ্বলিত সন্দলের কাছে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আমাকে ঘরের ভেতর বসিয়ে রেখে পূজারী আবার বাইরে চলে গেলেন।

মন্দিরে তিন খানা মেটে ঘর। একটি উত্তরে, অপর দুটি পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত। প্রত্যেক ঘরের বারান্দার সংগেই পরস্পরের যোগাযোগ রয়েছে। শীতের দেশের ঘরগুলি এরূপ করেই তৈরী হয়ে থাকে। উত্তরের ঘরখানা কালীর মন্দির। পূর্ব দিকের ঘরে রান্না করা হয় এবং পশ্চিম দিকের ঘর অতিথির জন্য। ঠাকুর রান্নাঘরেই শোন বলে মনে হল। সন্দলের কাছে অনেকক্ষণ বসে থাকতে ভাল লাগল না, পাশেই একটা বড় বালিশ ছিল, তাতেই হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না, যখন ঘুম ভাংল তখন দেখলাম পূজারী আমার ভোজনের বন্দোবস্ত করছেন। ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো আমাকে বিছানার বাইরে বসে খেতে বলবেন, কিন্তু তা তিনি বলেন নি। বিছানার ওপর বসেই খেয়ে নিলাম। আফগানিস্থানে এঁটোর বালাই নেই। যত এঁটোর বালাই শুধু ভারতেই। পৃথিবীর আর কোথাও এঁটো বলে কিছু নেই। আমাদের দেশের জ্ঞানীগণ বলেন, এঁটোর বালাই রাখা ভাল, তাতে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু যে দেশের লোক অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে এবং গবর্নমেণ্টের ঔদাসীন্যের ফলে সহস্র পথে স্বাস্থ্য হারাচ্ছে, তাদের মাঝে স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে এঁটোর গোঁড়ামিকে বজায় রাখার সার্থকতা কি তা বোঝা আমার পক্ষে শক্ত।

আহারের পর একবার কালীর র্তি দেখতে গিয়েছিলাম। কালী

মূর্তির কাছেই নারায়ণেরও একটি বিগ্রহ রাখা হয়েছে। আমি যখন বিগ্রহগুলিকে মন দিয়ে দেখছিলাম, তখন ঠাকুর ভাবছিলেন আমি নিশ্চয়ই একজন মহা ভক্ত। কিন্তু তিনি জানতেন না, আমি ভক্তির প্রেরণার বশে মূর্তিগুলির দিকে তাকাচ্ছিলাম না, আমি দেখছিলাম ওদের গঠনপ্রণালী।

কতকদিন ধরে ক্রমাগত চলার ফলে শরীরটা নেতিয়ে পড়েছিল। তাই খেয়েদেয়েও আর বাইরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সন্দলের কাছেই বসে আফগানিস্থানের ম্যাপখানা দেখতে লাগলাম।

বেলা বোধ হয় তখন ছ-টা। এরই মাঝে পূজারী তাঁর সহকারীসহ আমার কাছে এসে বললেন, রাত্রে আমাকে মন্দিরে থাকতে দেওয়া হবে না। আমি তাঁদের কথা শুনে ধীরে আস্তে বললাম, যে-পর্যন্ত আমার থাকার অন্য বন্দোবস্ত না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না এবং আমার অন্যত্র থাকার বন্দোবস্ত তাদেরই করতে হবে। আমার দৃঢ়তা দেখে পূজারী দুজন বাইরে চলে গেলেন। কতক্ষণ পর আবার যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখন তাঁদের সংগে আরও একজন লম্বা বৃদ্ধ লোক ছিলেন। বৃদ্ধলোকটি এসেই আমাকে নমস্কার করে বললেন, তিনি বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী এবং তাঁর মন্দিরেই আমার রাত কাটাবার সুবন্দোবস্ত হয়েছে। আমি কোন কথা না বলে সাইকেলটা টেনে নিয়ে তাঁর সংগে চললাম।

আমাদের পথের বাঁদিকে রুশিয়ার কনসালের বাড়ি। কনসালের বাড়ির ওপর মস্তবড় একখানা বর্তমান রুশিয়ার পতাকা পত পত করে উড়ছিল। তারপরই ডানদিকে পড়ল জাপানী কনসালের বাড়ি। ছোট একটা সূর্য-মার্কা পুরাতন ময়লা কাপড় ঘরের দরজার কাছে উড়ছিল। তারপরই শুরু হল উঁচু ভূমি। দুদিকে সারি দিয়ে

মেটে ঘরগুলি দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেকটি ঘরেরই দরজা বন্ধ। পথে লোকের চলাচল নেই বললেই চলে।

মেটে ঘরের সারি দেখে দেখে কতক্ষণ চলার পর বিষ্ণু-মন্দিরের পূজারীর বাড়ির সামনে এলাম। দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে পূজারী দরজার কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে দিল একটি যুবক। যুবকটিকে দেখে বেশ সরল বলে মনে হল। পরে জানলাম এই যুবক পূজারীর কনিষ্ঠ ছেলে। ছেলেটির গালভরা হাসি দেখে আপনা হতেই তার সংগে কথা বলতে ইচ্ছা হল এবং তারই সংগে কথা বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলাম।

বিষ্ণু মন্দিরের পূজারী শ্রেণীতে সাহা। এখানেও তিনখানা ঘর এবং সেই একই ধরনে তৈরী। বসবার ঘরে এসে দেখলাম আমার অপেক্ষায় অনেকগুলি লোক বসে আছে। তারা প্রত্যেকেই আমার সংগে কথা বলবার জন্য উৎসাহিত হয়েই বোধহয় বসে ছিল। একজন ব্রাহ্মণও সেখানে ছিলেন। তাঁর একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি তাঁর প্রতিটি বক্তব্য শেষ করে উপসংহারে বলতেন, যারা ধর্ম বজায় রেখে চলতে পারে না তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করাই উচিত।

দিনের বাকি অংশ কেটে রাত্রি এল। পরদিন প্রভাতে চা-পানের পর লক্ষ্য করলাম এখানকার পূজারীও যেন কেমন একটা বিরূপ ভাব প্রকাশ করছেন। তাঁর সে ভাবটি বুঝতে পেরে আমি তাঁকে বললাম, ঠাকুর মশায়, এখান হতে আমাকে তাড়াতে পারবেন না, আমি একমাস এখানে থাকব। খরচ যা লাগে তা দেব, কিন্তু এখান হতে চলে যাও, অথবা এখানে এক দিনের বেশি থাকবার নিয়ম নেই—এসব কথা বললেই আমি বলব আপনি চলে যান। এটা দেবমন্দির, সকল হিন্দুর অর্থের সাহায্যে এটা তৈরী হয়েছে, আমারও এতে অধিকার আছে। জানেন তো হিন্দুস্থানের অনেক হিন্দু-মন্দিরই সার্বজনীন হয়ে গেছে।

আফগানিস্থানেও যদি আমি সেরূপ কিছু করতে প্রয়াসী হই তবে দরিদ্র হিন্দুরা নিশ্চয়ই আমার সহায় হবে। এরূপ অবস্থায় ভেতরের কথাটা আমাকে খুলে বলাই আপনার পক্ষে ভাল হবে। আমার অনুমান হয় আপনারা সরকারী হাংগামাকে এড়াবার জন্যই এরূপ করছেন। তাই যদি হয় তবে আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি, সরকারী তরফ থেকে আপনার উপর কোন বিপদ আসবে না।

পূজারীর সংগে আর কথা হল না। ঘরে বসে থাকতেও আর ইচ্ছা হল না, তাই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। কাবুল শহরের বুকের উপর যে প্রসিদ্ধ রাজপথ আছে তার নাম আমি তখনও জানতাম না, এখনও জানি না। তবে পথটির প্রসিদ্ধির কারণ আমাকে জানতে হয়েছিল। এই পথের ওপর হোটেল কাবুল। কাবুল হোটেল বলা উচিত ছিল। কিন্তু পোস্ত ভাষার ওপর ইরানি ভাষার প্রভাব পড়াতে কাবুল হোটেল হোটেল কাবুল হয়ে গেছে।

মন্দির হতে বের হয়েই এক বৃদ্ধ পাঠানের দোকান হতে এক প্যাকেট রুশিয় সিগারেট কিনলাম। দোকানী আমার মুখের দিকে একটু চাইল, তারপর সিগারেট দিয়ে বিদায় করল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে একটি চাএর দোকান দেখতে পেলাম। আমার অভ্যাসই হল চাএর দোকানে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করা। এই দোকানটি উচ্চ শ্রেণীর ইউরোপীয় ধরনের। সুন্দর এক একটি গোল টেবিলের চারপাশে ভেলভেট মোড়া সোফা। টেবিলের ওপর ছাইদান এবং দেশলাই ছাড়া আর কোন বস্তু নেই। 'ডিপ্লমেটরা টেবিলের ওপর বাজে জিনিস কিছুই পছন্দ করেন না। সেজন্যই মনে হয়েছিল এটাও বোধ হয় ডিপ্লমেটদেরই একটা আড্ডা হবে।

আফগানিস্থানে দু রকমের চা-এর প্রচলন আছে, যথা, ইংলিশ

চা এবং "চায়"। দারজিলিং সিংহল এবং আসাম হতে আফগানিস্থানে যে চা যায় তাকে ইংলিশ চা বলা হয়। ইংলিশ চা-তে দুধ এবং চিনির দরকার হয়। "চায়" আসে চীন দেশ থেকে। সেই পাতা গরম জলে ভিজিয়ে দিলেই কাথ বের হয়ে আসে। সেই ক্বাথকেই বলে "চায়"। এই দোকানে "চায়"এর প্রচলন নেই। আমি চা-এর আদেশ দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বসেছি এমন সময় আমার গরিবানা পোশাক দেখে বয় এসে বললে, হুজুর এখানের চা'এর দাম খুব বেশি এবং এখানে "চায়" বিক্রি হয় না। আমি বললাম, চা-এর যদি বেশি দাম হয় তবে কাফি নিয়ে এস, দু কাবুলির বেশি বোধ হয় হবে না। লোকটি বুঝল আমার কাছে টাকাকড়ি আছে। সে ফের বললে, চা আনব না কাফি আনব হুজুর? কাফিই নিয়ে এস— বলে পকেট হতে কতকগুলি কাগজ বের করে সে দিকে মন দিলাম। অনেক দিনের জমানো কথা ডাইরিতে লিখে উঠতে পারিনি। এরূপ নিরিবিলি এবং এত আরামদায়ক স্থানে বসলেই লিখতে ইচ্ছা হয়। আফগানিস্থানে কাফি মোটেই ব্যবহার হয় না তাই বয় চা আনতেই বাধ্য হল। সে চা নিয়ে এলে, তার মুখের দিকে একটু ভাল করে তাকিয়ে বুঝলাম লোকটি পাঠান নয়, বিদেশী। ছদ্মবেশে এখানে আছে। পরে বুঝতে পেরেছিলাম এই লোকটি সত্যসত্যই পাঠান বয় নয়, সে একটি ভারতীয় শিক্ষিত লোক। কথা প্রসংগে এই লোকটির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে হবে, সেজন্য এখানে তার কথা ছেড়ে দিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম সেই কথাই বলছি। এক কাপ চা খেয়ে আমার চায়ের পিপাসা মিটল না। ফের আর এক কাপ চা আনতে বলার পূর্বেই প্রথম কাপের দাম চুকিয়ে দিতে যাব এমন সময় বয় বললে, এক সংগে দিলেই হবে। এক সংগে দিলেই হবে কথাটা নিশ্চয়ই বাংলা।

একজন বাংগালী চায়ের দোকানে বয়ের কাজ করছে দেখে চমৎকৃত হলাম। মুখে কিছুই প্রকাশ করলাম না। বয় দ্বিতীয় বার চা নিয়ে এলে বললাম, এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে দিতে পারেন? লোকটি হঠাৎ যেন আকাশ হতে পড়ল, এমনিভাবে বললে, আপ ক্যা বোলা? আমি বললাম, হাম বলা ইদার মে সিগারেট মিলেগা?

—জরুর জনাব, পয়সা দিজিয়ে—বলেই লোকটি হাত পাতল। পাঁচটি কাবুলি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও। লোকটি সিগারেট নিয়ে এল এবং বাকি পয়সা ফিরিয়ে দিল।

চায়ের দোকান হতে বের হয়ে আসার পর শুনলাম দুজন লোক হো হো করে হাসছে। যাকগে এদের হাসি। এখন একবার বৈদেশিক সচিবের সংগে সাক্ষাৎ হলে ভাল হয় ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। অলি-গলি পথ ধরে চলে যখন বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করলাম তখন ভাবলাম এখন আর বৈদেশিক সচিবের বাড়িতে গিয়ে দরকার নেই, চায়ের দোকানটাতেই গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খেয়ে পুরোহিত মশায়ের আশ্রয়ে গিয়ে বিশ্রাম করাই উচিত।

কিন্তু চায়ের দোকানের পথটার কোন হদিসই করতে পারলাম না। শেষে কাবুল হোটেল কোথায় আছে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে কাবুল হোটেলে এলাম। কাবুল হোটেল পূর্বোক্ত চায়ের দোকানের কাছেই। দ্বিতীয় বার আমাকে চায়ের দোকানে ফিরে আসতে দেখে ছদ্মবেশী বয় একটু থতমত খেয়ে গেল। আমি ইংলিশে বললাম, চা খেতে আমার বড়ই ভাল লাগে। এখানে আপনারাই সব চেয়ে ভাল চা প্রস্তুত করেন। আমাকে এখানে বার বার আসতে হবেই। আর এক কাপ চা দিন দয়া করে। বয় চা নিয়ে এল। চা পানান্তে আমি

মন্দিরে ফিরে এলাম। পথে বার বার শুধু মনে পড়তে লাগল সেই কথাটি—এক সংগে দিলেই হবে।

মন্দিরে এসে দেখলাম পূজারী আমার জন্যও রান্না করেছেন। কিন্তু তাঁর মনের কোণে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড় কোন্ দিকে বইবে তিনিই জানেন। যাহোক, আমি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। রান্না হয়েছিল খিঁচুড়ি। খিঁচুড়িতে ছিল মোটা পরিমাণের ঘি। এদেশেও ঘি দরিদ্র লোকের ভাগ্যে জুটে না। ঘি খান ধনীর দল। বিষ্ণু মন্দিরের পূজারীও একজন ধনী লোক। তাঁর বাড়িতেও বস্তা বস্তা চাউল চিনি এবং টিন ভর্তি ঘি মজুত ছিল।

পূজারী ঠাকুর ভোজনের পূর্বে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, তারপর ধীরে ধীরে অংগুলির সাহায্যে খেতে লাগলেন। অন্যান্যরাও সেরূপ ভাবে খেতে লাগল। শুধু আমি চামচের সাহায্যে খেতে লাগলাম। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে পূজারী প্রত্যেকের থালা পরীক্ষা করে দেখলেন, খাদ্যের এক কণাও কারো থালাতে লেগে আছে কি না। পরিদর্শন হয়ে গেলে তিনি ভৃত্যকে থালাগুলি নিয়ে যেতে বললেন। চা তৈরীই ছিল। ভাত খাওয়ার পর চা খাওয়া হল। খাওয়া দাওয়া হলে নাসিকা গর্জন সহকারে সবাই ঘুমাতে লাগলাম।

বিকাল বেলা স্থানীয় হিন্দু-প্রতিনিধি বলে কথিত একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। মুখ দেখলেই লোকটিকে খল প্রকৃতির মনে হয়। কায়দামাফিক নমস্কারের আদান-প্রদান সারা হলে প্রৌঢ় বললেন, আপনি আমাদের অতিথি, আপনি আমাদের পূজ্য, কিন্তু বড়ই দায়ে পড়ে কএকটি কথা বলতে হচ্ছে, আপনি কথাগুলি মন দিয়ে শুনুন। এখানকার নিয়ম মতে, যে-কোন ভারতবাসী এদেশে আসুক, কাবুলে পৌছার পরই তাদের প্রত্যেকেরই আমার কাছে

রিপোর্ট করতে হয়, আপনি তা করেননি। আমার এখন কর্তব্য হল, আপনাকে পুলিশ অফিসারের কাছে হাজির করা। তাঁর আদেশ অনুসারে প্রত্যেক কুড়ি দিন অন্তর আপনাকে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে অথবা আমার কাছে এসে আপনি কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন তার রিপোর্ট দিতে হবে। এ কথাটা পুলিশ অফিসারের সামনেই আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি দোভাষীরও কাজ করি। আপনি কাবুলে আসার পর আমার কাছেও যাননি, কোন পুলিশ অফিসারের কাছেও যাননি ; সেজন্য হয়তো আপনাকে কষ্ট পেতে হবে। উপরন্তু আপনি আফগানিস্থানে পৌছেই পল্টনি অফিসার, ছাত্র এবং জনসাধারণের সংগে অবাধে মেলামেশা করছেন। এসব আফগান সরকারের মনঃপূত হবে কিনা জানি না। যা হোক আপনাকে কাল আমার সংগে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে।

প্রৌঢ় যদিও আফগানিস্থানেরই বাসিন্দা এবং কোনও উপজাতিরই লোক হবেন, তবুও তাঁর কথায় গোলামি ভাবের বেশ একটা ছাপ ছিল। এত কষ্ট করে একটা স্বাধীন দেশে এসেছি, সেখানেও দেখছি গোলামির ছাপ। কিন্তু আমি পাঠান ছেলেদের সংগে থেকে থেকে মনের ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলতে পেরেছিলাম। আমি বললাম, মশাই, এসব আইন কানুনের ধার ধারি না, কাল সকালে যদি আমাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হয় তবে আপনি টমটম (এক-ঘোড়ার গাড়ি) নিয়ে আসবেন। নতুবা যাব না। আপনার শক্তি অনুযায়ী যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

প্রৌঢ় একটু কুপিত হয়ে বললেন, আপনার মত অনেক লোক দেখেছি সাহেব। এইতো কএক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাব হতে কতকগুলি মসলমান ছাত্র এসেছিল। তারা গোঁ ধরে বললে, আমার সংগে সাক্ষাৎ

করবে না। তারা মুসলমান, মুসলমান অফিসার ছাড়া আর কারো সংগে কথা বলবে না। কিন্তু তারা জানত না এদেশে ধর্মের হিসাবে কর্মচারী নিয়োগ হয় না। রাষ্ট্রগত ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি এখানে ভারতবর্ষের লোকজনের তদবির করি, সে যে-কোন ধর্মের লোকই হোক। কিন্তু তারা তা চায় না। তারা চায় আমার স্থলে একজন মুসলমান নিযুক্ত হোক। আমি হলাম তিন যুগের ভুষণ্ডী কাক। আমান উল্লা, বাচ্চা-ই-সাকো, নাদির শা এই তিন জনকেই আমি দেখেছি। বর্তমান রাজা জাহির শা আমাকে নতুন নিযুক্তিপত্র দিয়েছেন। এর পূর্বেও আমি এ কাজই করতাম। আপনি বলছেন আমার কথা শুনবেন না, কালই দেখব আপনার কত শক্তি।

আমি বললাম, আমার প্রসংগ এখন চাপা দিয়ে বলুন তো ঐ পাঞ্জাবী মুসলমান যুবকদের কি হয়েছিল ?

—তাদের হবে আর কি। এখানে হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নেই, আমি আমার স্থানেই রয়ে গেলাম, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল।

আমি বললাম, আমাকেও না হয় তাড়িয়ে দেবেন, আর কি করতে পারেন বলুন ?

প্রৌঢ় হেসে বললেন, তবে এদেশে না এলেই পারতেন।

পরদিন ভোর বেলায় আবার তিনি এসে হাজির হলেন। আমি তখনও লেপের নিচেই ছিলাম। অনিচ্ছায় লেপ ছাড়তে হল। মুখ হাত ধুয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে বসলাম গিয়ে টমটমে। টমটম প্রবল বেগে পুলিশ স্টেশনের দিকে চলল। সকাল বেলা যারা পথে বের হয়েছিল, আমাকে ঐ প্রৌঢ় রাজকর্মচারীটির সংগে দেখে তাদের অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার মনে হল লোকটা জহ্লাদ

নিশ্চয়ই হবে, নতুবা যে তাকে দেখছে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন? আমি মনের ভাব গোপন না করে জিজ্ঞাসা করলাম, দেখছেন কি, যে আপনাকে দেখছে সে-ই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? তার কারণ কি বলুন তো।

উত্তর হল, এসব কারণ এখন বলা হবে না, তোমাকে একবার পুলিশ স্টেশনে হাজির করি তারপর অন্য সময় এসব কথা হবে।

লক্ষ্য করলাম, লোকটির কথাবার্তায় ক্রমেই শিষ্টাচার লোপ পাচ্ছে।

পুলিশ অফিসারের অফিস শহরের একটু বাইরে। বাড়িখানা একতালা মেটে ঘর। বর্তমান সভ্যতার ছাপ তাতে একটুও পড়েনি। বাড়ির বাইরে একটিও লোক নেই। এখানেও দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে হল। কড়া নাড়তেই একজন দরজা খুলে দিলে আমরা একখানা ছোট রুমে গিয়ে বসলাম। রুমটির সামনেই একটা লম্বা ঘর। সেই ঘরটার বিপরীত দিকেও আর একটা ঘর। সেই ঘরটাতে অফিসার বসে ছিলেন। কাবুল শহরের সবচেয়ে বড় অফিসারের বাসস্থান এবং তাঁর অফিসের সংগে আমাদের দেশের যে কোন থানার দারোগার অফিস এবং তাঁর থাকবার ঘরের তুলনা করতে পারা যায়। কাবুলী দারোগার অফিস এবং থাকবার ঘর আমাদের দেশের থানা ও অফিসারের বাসগৃহের মত হয়তো তত ভাল নয়, কিন্তু কাবুলের পুলিশ আমাদের দেশের দারোগা মহাশয়দের মত মনোভাব পোষণ করে না, তারা শান্ত এবং ভদ্র। তারা ভাল করেই জানে, রাজার রাজত্ব যে কোন সময় যেতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণ থাকবে। সর্বসাধারণের দেওয়া মাইনে আবার নতুন করে পেতে হলে সর্বসাধারণকেই সন্তুষ্ট রাখা দরকার।

পুলিশ অফিসার কএক মিনিটের মাঝেই এসে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি ফরাসী ভাষা জানি। আমি জানালাম, ফরাসী ভাষায় আমার কোন ব্যুৎপত্তি নেই তবে হিন্দুস্থানী এবং ইংলিশ বলতে পারি। অফিসার ইংলিশ জানতেন কিন্তু ইংলিশ বলতে তিনি মোটেই রাজি নন। আমার কাছে কিন্তু ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ উভয়ই বিদেশী। ফরাসী ভাষা আমার জানা না থাকায় এবং পুলিশ অফিসার ইংলিশ ভাষায় কথা বলতে অনিচ্ছুক থাকায় আমরা হিন্দুস্থানী ভাষাকেই বাহন করে কথা বলতে লাগলাম। প্রৌঢ় রাজকর্মচারী আমাদের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবেননি আফগানিস্থানের একজন উচ্চতম পদের পুলিশ অফিসার আমাকে এত সম্মান ও ভালবাসা দেখাবেন। তিনি দাঁড়িয়েই ছিলেন। আমরা বসে কথা বলছিলাম এবং চাও খাচ্ছিলাম। কথা প্রসংগে পুলিশ অফিসার বললেন, আপনাকে প্রত্যেক কুড়িদিন অন্তর এখানে এসে অথবা নিকটস্থ পুলিশ স্টেসনে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে।

—আমাদের দেশে হাজার হাজার কাবুলি বসবাস করছে, তারা তো পুলিশ স্টেসনে কুড়িদিন অন্তর হাজিরা দেয় না ?

—সে সংবাদ আমরা রাখি। আমরাও চাই না আপনারা আমাদের দেশে এসে কুড়িদিন অন্তর পুলিশ স্টেসনে হাজিরা দেন। লক্ষ্য করে দেখবেন, যখনই আপনি কোন পুলিশ স্টেসনে হাজিরা-পরওয়ানা নিয়ে হাজির হবেন, তখনই পুলিশ অফিসার আপনাকে সত্বর বিদায় দিতে পারলেই যেন রক্ষা পায় এমনি ভাব দেখাবে। আমরা এসব চাই না, তবে কিনা—

—আর বলতে হবে না, আমরা মানুষ নই বলেই এই ব্যবস্থা।

—আপনারা আমাদের মত হন এই আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা। নিন আর এক পেয়ালা চা খান।

—আর চা খেয়ে লাভ নেই এখন বিদায় হতে চাই, কিছুই ভাল লাগছে না।

—আপনার ইচ্ছা। এখানে আটকিয়ে রাখার জন্য আপনাকে আনা হয়নি। যখনই দরকার হবে তখনই উর্দুভাষাভাষীদের তত্ত্বাবধায়ককে বলবেন, তাঁর সাধ্যায়ত্ব হলে তিনি সাহায্য করবেন, নতুবা আমার কাছে চলে আসবেন।

—এই ভদ্রলোক কি হিন্দু তত্ত্বাবধায়ক নন?

—না, ইনি তো হিন্দু নন, দুরানি।

—তবে তিনি হিন্দু-প্রতিনিধি বলে পরিচয় দেন কেন?

—প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের যত লোক এখানে বসবাস করে তাদের ভালমন্দ তিনি দেখে থাকেন। হিন্দুস্থানের বাসিন্দাকে বৃটিশরা বলে ইণ্ডিয়ান, ফরাসীরা বলে হিন্দুঁ। আমরা এখানে বৈদেশিক ভাষা ফ্রেঞ্চই ব্যবহার করি, সেজন্যই এঁকে হিন্দু-প্রতিনিধি বলে অন্যায় করা হয়নি।

—আপনি বললেন হিন্দুস্থানের বাসিন্দা উর্দু বলে, আমরা কিন্তু উর্দু বলতে অন্য আর একটা ভাষা বুঝি।

—আপনারা যাই বুঝুন, আমরা বুঝি ভারতের সর্বসাধারণ যে মিশ্রভাষা বলে তারই নাম উর্দু। উর্দু মানেই হল মিশ্রভাষা।

পুলিশ অফিসারের সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখে হিন্দুতত্ত্বাবধায়কের মনের পরিবর্তন হল। পথে এসে তিনি আমার সংগে মধুর বচনে বাক্যালাপ করতে লাগলেন এবং দুএকবার আমাকে বললেন যে পূজারীকে বলে কয়ে তিনি আমার আরও ভালভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করবেন। বিষ্ণু মন্দিরে এসেই তিনি আমার সামনেই পোস্ত ভাষায়

পূজারী ঠাকুরকে কি বললেন। দেখতে দেখতে পূজারী ঠাকুরেরও মনোভাবের আশ্চর্য পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

কএক দিন হল আমার স্নান হয়নি। কাবুলে আসার পর স্নানাগারের সন্ধানও কারো কাছে জিজ্ঞাসা করিনি। পূজারীকে স্নানাগারের সন্ধান জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, মন্দিরে স্নানাগার নেই, সরকারী স্নানাগারে গেলেই সুবিধা হবে। তারপরই বললেন, হিন্দুরা সাধারণত রাত্রের বেলাই স্নানাগারে স্নান করতে যায়, আমিও যেন তাই করি। আমি বললাম, দিনের বেলা হিন্দুরা স্নানাগারে যায় না কেন? পূজারী বললেন, যায় না কেন তা হিন্দুপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করুন। হিন্দুপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি বললেন, মুসলমানেরা দিনের বেলায় যায় বলেই আমরা রাত্রে যাই। আমি বললাম, হিন্দু মুসলমানের আমি ধার ধারি না। ইচ্ছা করলে দিনের বেলাও স্নান করা যায়, একথাই আপনার কথার অর্থ নয় কি? হিন্দুপ্রতিনিধি আমতা আমতা করতে লাগলেন দেখে আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম, স্নানাগারটি কোথায় দেখিয়ে দেবার জন্য একজন লোক দিলেই হবে, এখনই আমি স্নান করতে যাব।

পূজারীর বড় ছেলে কাছেই বসা ছিল, সে আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে রাজি হল। আমরা উভয়ে ঘর হতে বেরিয়ে স্নানাগারের দিকে রওয়ানা হলাম।

পথে মাংসের, মাছের এবং সবজির বাজার হয়ে গেলাম। কতক-গুলি মাংসের দোকানে দেখলাম ইহুদিরাই শুধু মাংস কিনছে, হিন্দু অথবা মুসলমান সেখানে যাচ্ছে না। পূজারীর ছেলে বললে, এখানে ইহুদীদের জন্য পৃথক কশাইখানা আছে, ইহুদিরা মুসলমানদের কাটা

মাংস খায় না। ইহুদিদের জীবহত্যা মুসলমানদের মত নয়, তারা শুধু কণ্ঠনালিটাই কাটে, মুসলমানরা তা না করে গলার দুদিকের দুটা রগ পর্যন্ত কেটে দেয়। দুরকমের কশাইখানা দেখে মনে হল ইচ্ছা করলেই এখানে আচার-ব্যবহারের পার্থক্য বজায় রাখতে পারা যায়। উভয়ে স্নানাগারের কাছে এলাম। পূজারীর বড় ছেলে আমাকে স্নানাগারের দরজার কাছে রেখেই নিকটস্থ একটি হিন্দু দোকানে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বসে রইল।

স্নানাগারে প্রবেশ করেই স্নানাগার রক্ষককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম মাথার টুপিটা কোথায় রাখা যায়। সে কাছেই একটা ঘর দেখিয়ে দিল। সেখানে কোট টুপি মাফলার ইত্যাদি রেখে স্নানাগারের দিকে যাচ্ছি এমন সময় দারোওয়ান বললে, আপ মুসলমান হ্যায় ?

আমি বললাম, নেহি। সাবুন কিদার হ্যায়, টাওয়েল কিদার হ্যায় ? তুমি বহুত বুঙ্কু আদমি হ্যায়, মুসলমানিসে তোমারা কিয়া জরুরত ?

—হুজুর কুছ নেই, এবি সব চিজ লে আতাহে।

—জলদি লে আও।

সাবান টাওয়েল নিয়ে এসে বাথরুমটা বেশ পরিষ্কার করে দিয়ে আদাব বলে সে অপেক্ষাগারে গিয়ে দাঁড়াল। আমি এক ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যখন স্নানাগার হতে বের হলাম তখন আমি নূতন মানুষ। কাপড় পরে স্নানাগারের ফি এক কাবুলি দারোয়ানের হাতে দিয়ে আর এক কাবুলি তাকে বকশিস দিলাম এবং বললাম, ফের তিন রোজ বাদ আয়েংগা। হাম মুসলমান নেই হ্যায়, হিন্দুস্থানকা বাংগালি হিন্দু। দরোয়ান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

যতদিন কাবুলে ছিলাম, প্রত্যেক তিন দিন অন্তর স্নান করতে

যেতাম। দারোওয়ান আমার ধর্মমত আর কখনও জিজ্ঞাসা করেনি। তাকে আর বকশিসও দেইনি। একদিন একজন উচ্চশ্রেণীর অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হিন্দুদের দিনের বেলা স্নান করতে দেওয়া হয় না কেন ?

তিনি বলেছিলেন, আপনাকে স্নান করতে দেয়নি ?

—আমাকে দেবে না কেন, স্থানীয় হিন্দুদের কথা বলছি।

—ওদের কথা বলবেন না, ওরা ইচ্ছা করেই নিজের জন্য নিয়ম গড়েছে। গেলেই হয়, কেউ বাধা দেবে না। এরা এত ভীরু এবং কাপুরুষ যে কিছু বলবার পূর্বেই সরে পড়ে। এজন্যই এদের এই দুর্দশা।

স্নান করে বাইরে এসে নিকটস্থ একটি চায়ের দোকানে প্রবেশ করলাম। এই দোকানে "সবজ্ চা" বিক্রি হয়। তবে তাতে চিনি ব্যবহার হয়। চায়ের এতই পিপাসা হয়েছিল যে চার পেয়ালা চা খাবার পর আমার তৃষ্ণা মিটেছিল। দোকানি এবং অন্যান্য লোক আমার দেশ কোথায় জিজ্ঞাসা করেছিল। যখন তারা শুনল আমি কলকাতা হতে কাবুলে সাইকেলে করে এসেছি তখন তারা প্রত্যেকেই আমার করমর্দন করল। এদের কথা শুনে মনে হল বাংলা দেশে কোন ধর্মের প্রভাব নেই, আছে শুধু তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব। একজন বললে, বাংগালীদের ভয়ের কোন কারণ নেই, ওরা যাদুশক্তির প্রভাবে বাঘকে কুকুর বানিয়ে রাখে। এদের কথার প্রতিবাদ করা দূরে থাক আমার বেশ আমোদই বোধ হচ্ছিল।

মন্দিরে ফিরে না এসে ফের সেই বড় চায়ের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। বয়টি ছিল না, এক শিখ তখন বয়ের কাজ করছিলেন। তিনি প্রকাশ্যেই আমাকে জানালেন, যদিও তিনি ভারতবাসী, তবু

বৃটিশের প্রজা নন, তিনি সভিয়েটের সভ্য। এখানেই থাকেন, তবে ইচ্ছা করেই তিনি এ দোকানে এসে কাজ করেন। সভিয়েট দেশ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বললেন না, তবে কএক দিনের মাঝেই আমি নতুন কিছু জানব এই মাত্র ইংগিত করলেন। আমি চা খেয়ে বৈদেশিক সচিবের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

বৈদেশিক সচিবের বাড়ি বেশি দূরে নয়। কাবুল হোটেল পার হয়ে গিয়ে একটু হাঁটলেই বৈদেশিক সচিবের অফিস পাওয়া যায়। বৈদেশিক সচিবের বাড়ির সামনে কোন পুলিশ তো ছিলই না, একটা দারোয়ানও না দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল, এখানে বৈদেশিক সচিব কি করে থাকতে পারেন। হয়তো আমি ভুল করেছি। কিন্তু আমি ভুল করিনি ঠিক স্থানেই এসেছিলাম। বারান্দা পার হয়ে একটা দরজাতে ধাক্কা দিতেই একজন লোক আমাকে ফরাসি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, কি চাই। আমি হিন্দুস্থানিতে বললাম, বৈদেশিক সচিবের সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। কথাটা শুনেই লোকটি আমাকে বসতে দিয়ে বৈদেশিক সচিবকে খবর দিতে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, স্বাধীন দেশে সবই সম্ভব। এত বড় একজন অফিসার অথচ তাঁর অফিস তাঁর বাড়ি এসব দেখলে মনে হয় যেন একজন সাধারণ লোকের বাড়িতেই এসেছি। যারা গৌরী সেনের টাকায় কাজ চালায় তারাই নবাবী চালে চলে।

বৈদেশিক সচিব নিজে বাইরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

—আপনার অটোগ্রাফ।

—আপনি কে?

—আমি একজন ভূ-পর্যটক।

—আমি ভূ-পর্যটকদের অটোগ্রাফ দিই না।

—আপনাকে ধন্যবাদ। বলতে পারেন এখানকার প্রধান মন্ত্রী থাকেন কোথায়?

—বহু দূরে।

—তবুও কত দূর?

—তা আমি জানি না।

এই বলেই তিনি বিদায় নিলেন। আমি অপমানিত বোধ করে অবনত মস্তকে মন্দিরে ফিরছি এমনি সময় কাবুল-হোটেলের দারোয়ান আমাকে ডেকে বললে, ওপরে দুজন হিন্দু আপনাকে ডাকছেন। আমি হোটেলের ওপরে উঠতে উঠতে হোটেলের জাঁকজমক লক্ষ্য করতে লাগলাম। দারোয়ানকে কোন মতেই বুঝতে দিইনি আমি এসব লক্ষ্য করছি।

দুদিকে সারি দিয়ে রুম। মাঝ দিয়ে পথ চলেছে। ঘরের দুতলায় কাঠের মেঝে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার, তারই ওপর দামি কারপেট বিছানো। কারপেটে নানারূপ ফুল আঁকা। প্রত্যেকটি ফুল যেন আমার দিকে চেয়ে হাসছে। হাসবার কথাই। যে এই কারপেটখানা বুনেছে সে তার মজুরি ঠিকমত পায়নি। সেই দরিদ্র নিপীড়িত হাতের কারুকার্য আমাকে দেখে হাসবে নিশ্চয়ই, কারণ আমিও একজন গরিব। গরিব গড়তে পারে কিন্তু ভোগ করতে পারে না। এই কথাটা বুঝেই বোধ হয় ফুলগুলি হাসছিল। আমি আর ফুলের দিকে তাকালাম না। দেখতে লাগলাম ফুলদানিগুলিকে। বেশ পরিপাটি করে সাজানো। দেখতে বেশ ভালই লাগছিল। বেশি আর লক্ষ্য করতে পারলাম না, দুজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বাইরে এসে আমার করমর্দন করে তাঁদের রুমের ভেতর নিয়ে চললেন।

আপনি নিশ্চয়ই ভারতবাসী। মাথায় আপনার শোলার হ্যাট, পরনে ইউরোপীয় পোশাক, আপনি বেপরোয়া হয়ে পথে চলছেন। পাঠানরা আপনাকে কিছুই বলছে না বলেই মনে হয়, কিন্তু আমরা তা পারি না। মোটরে বসে আসতেই আমাদের বিপদ হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাঁদের বিপদটা আর কিছুই নয়, মোটর ড্রাইভার একবার মোটর থামিয়ে জংগলে গিয়েছিল, ইত্যবসরে এক বন্দুকধারী পাঠান এসে তার বন্দুকটা তাঁদের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিল। বন্দুক তাঁরা কিনেননি, উপরন্তু বন্দুকবিক্রেতাকে ডাকাত, আফ্রিদি, গলাকাটা এসব মারাত্মক বিশেষণে ভূষিত করে বিদায় করে দিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তাদের বিপদের কথা শুনতে শুনতে কাবুলের বৈদেশিক সচিবের নিকট অপমানের গ্লানিটা অনেক কমে গিয়েছিল। তাঁরা বললেন জাপানী টিপ বাতি বিক্রয় করার জন্য এখানে এসে তাঁরা মহাবিপদে পড়েছেন। শব্জীভোজী বৈষ্ণব মহাশয়গণ বন্দুকের কথা চিন্তা করে অনন্ত নরকের জন্য জীবন থাকতেই প্রস্তুত হতে রাজি ছিলেন না। অনুশাসন অনুসারে শব্জীভোজীদের বন্দুক দেখাও অন্যায়। বন্দুক ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উচ্চারণ করলেও নাকি তাঁদের আর্ম এক্টএ পড়ে অনন্ত কালের জন্য নরকগামী হতে হয়। এসব বিপদে ফের পা দিতে তাঁরা নারাজ সেজন্য তাঁরা প্রস্তাব করলেন, যদি আমার সুযোগ এবং সুবিধা হয় তবে আমার দ্বারাই টিপ বাতির কারবারটা এ যাত্রার মত সেরে নিয়ে চিরজীবনের তরে তাঁরা কাবুল শহরকে নমস্কার করে বিদায় নেবেন। তাঁদের ক্লীবসুলভ দৈন্য দেখে আমার দয়া হল। বললাম কাল সকালে এসেই তাঁদের বাজারে নিয়ে যাব এবং তাঁদের কাজ যাতে কালই শেষ হয় তার বন্দোবস্ত করব। পর দিন তাঁদের কাজ করে দিয়েছিলাম এবং সেই কাজের মজুরী

স্বরূপ তাঁরা আমাকে কাবুল হোটেলেই মুরগীর মাংস এবং পোলাও খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা কোনরূপ মাংস দিয়েই আমাকে ভোজন করাতে রাজি ছিলেন না, আমিও লতাপাতার পক্ষপাতী ছিলাম না। দায়ে পড়লে অনেকেই অনেক কুকাজ করতে বাধ্য হয়। সব্জিভোজী মহাশয়দের কন্যাদায় ছিল না, ছিল ব্যবসার দায়। তা হতে এ যাত্রার মত আমার সাহায্যে রক্ষা পেলেন।

এদের কাজকর্ম সেরে পরের দিন বেলা তিনটার সময় প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। অবশ্য এর পূর্বে চায়ের দোকানে গিয়ে পূর্বপরিচিত রহস্যপূর্ণ বয়টির কাছ হতে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির অনেক কথাই জেনে নিয়েছিলাম।

পথের উপর বরফ জমে পাথর হয়ে রয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস প্রবল বেগে বইছে। পথে গরিব লোক ছাড়া আর কেউ চলছে না। দুপাশের বাড়ির দরজাগুলি দেখলে মনে হয় অনেকদিন কেউ বুঝি ঘর হতে দরজা খুলে বের হয়নি। আমি নীরবে পথ চলছি। প্রধান মন্ত্রী আমার সংগে কথা বলবেন কি না, সে কথা ভাবছিলাম না। অনেক বড় লোকই সময়ের অভাবে কথা বলেননি, এখনও অনেকে দেখা সাক্ষাৎ হলে ভাবেন হয়তো ভিক্ষা চাইতে গিয়েছি। কিন্তু আজ বলছি পর্যটকের আদর আমাদের দেশে এখনও হয়ে ওঠেনি, কিন্তু পর্যটকগণ আমাদের যা দান করে গেছেন তা ফিরিয়ে দেবার মত কোন ধনীই আজ পর্যন্ত ভারতে কেন পৃথিবীতেও জন্মায় নি।

পথে চলতে চলতে হঠাৎ চোখের জ্যোতি লোপ পেতে লাগল। অন্ধ হয়ে যাচ্ছি বলে মনে হল। আমার ভ্রমণ বুঝি এখানেই শেষ হতে চলল। এ মহাবিপদ। যারা ভগবান বলে কিছু আছে বিশ্বাস করে তারা বেশ সুখী বলেই তখন মনে হল। তারা হয়তো এ অবস্থায় পড়ে
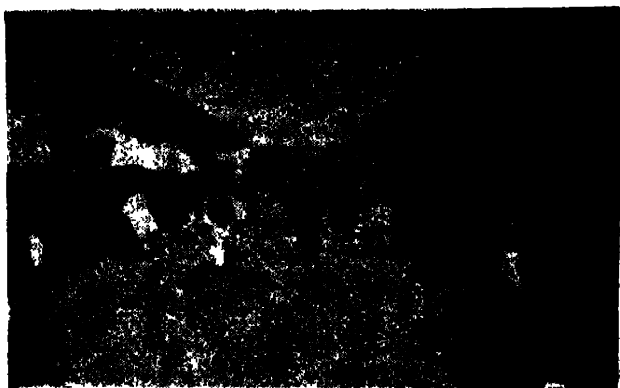
কাবুলের একটি বাজার

কাবুলে বৈদেশীক মন্ত্রীর দপ্তর

ভগবানের নামে কাঁদতে শুরু করত। কিন্তু আমার সে পথ বন্ধ। মাথার মাঝে চিন্তা স্রোত বইছিল। সেই চিন্তাধারার গতি কত দ্রুত তা আমি হিসেব করে বলতে পারতাম যদি চোখে দেখতাম। কারণ ঘড়ি হাতেই বাঁধা ছিল। মিনিটের কাঁটা টিক টিক করছিল। ভাবছিলাম কি করে এই শরীরটাকে নষ্ট করে এই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। হঠাৎ মনে হল সংগে কিছু বিষাক্ত দ্রব্য বা প্রাণঘাতী অস্ত্র থাকলে হয়তো বা তখনকার মনের অবস্থায় ভবলীলা সাংগ হতে দেরী হত না। কিন্তু হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাবার কারণ কি? কেন চোখে দেখতে পাচ্ছি না? শীতের জন্য নয়তো? সেদিন তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ শূন্য ডিগ্রি হতে সতেরো ডিগ্রি নীচে নেমে গিয়েছিল। মনে হল প্রবল ঠাণ্ডাই চোখের জ্যোতি লোপ হবার একমাত্র কারণ। চোখ দুটাকে গরম করার জন্য দুহাতে রগড়িয়ে দিলাম। তারপর হাতের তেলো দুখানাকে ঘসে গরম করে চোখে বার বার লাগাতে লাগলাম। একটু একটু করে যদিবা দৃষ্টি ফিরে আসতে লাগল, কিন্তু এদিকে পা দুখানা অবশ হয়ে যেতে লাগল। এরূপভাবে পা ঠাণ্ডা হয়ে অবশ হতে শুরু হলেই মনে করতে হবে প্রাণ শরীরে থাকবার আর বেশি সুযোগ পাবে না। চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখলাম প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটা চায়ের দোকান। এই দোকানে যেতে পারলেই আমার প্রাণ বাঁচবে। কিন্তু পা নড়ছে না। তখন চিৎকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। চিৎকার করে লোক ডাকতে লাগলাম। চায়ের দোকান হতে কএকজন পাঠান বেরিয়ে এসে আমাকে টেনে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে পায়ের জুতা খুলে ফেলে বরফ ঘসে ডলতে লাগল। ডলার পর পা দুটাতে শক্তি ফিরে এল। তারপর তারা আমাকে উপর্যুপরি কএক পেয়ালা চা খাওয়ালে।

চা খেয়ে শরীরে শক্তি এল, চোখের দৃষ্টি ভাল করেই ফিরে পেলাম। অবশেষে পা দুখানাকে আগুনের কাছে রেখে একটা কাঠের টুকরার উপর চুপ করে বসে রইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলাম। তখন আমার মনে কি আনন্দ, যে সকল পাঠান আমাকে সাহায্য করেছিল এবং যতগুলি পাঠান ঘরে বসে ছিল, তাদের প্রত্যেককে চা-এর নিমন্ত্রণ করলাম। দোকানী প্রত্যেককে চা দিল। প্রত্যেকটি পাঠান আমার ব্যবহারে খুশী হয়েছিল। একজন বলেছিল, আপনাকে আমরা সাহায্য করেছি, সেটা আমাদের কর্তব্য ছিল। আপনি আমাদের যদি চা না খাওয়াতেন তবুও আমরা আপনাকে কিছুই বলতাম না। আমরা সবাই খোদার বান্দা, খোদারই অনুগ্রহে আজ আপনি বেঁচে গেছেন। খোদার দয়ায় আমরা না থাকলে আপনার মরণ আজ অনিবার্য ছিল।

আমি লোকটির কথার জবাবে শুধু বললাম, আপনাদেরই অনুগ্রহ।

প্রচুর পরিমাণে চা খেয়ে পাঠানদের শরীর বেশ গরম হয়েছিল, সেজন্যই বোধহয় গল্পও জমে উঠেছিল বেশ। গল্প হল নানা রকমের। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সবাই এই গল্পস্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন। আমি বাচ্চ-ই-সাক্কোকে সেই গল্পস্রোতে ভাসাতে চেষ্টা করলাম। আমার চেষ্টা সফল হল তার একটি কারণ ছিল। এই পাঠানগুলি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিল। পাঠানরা সকল সময়ই কতকগুলি নিজস্ব নিয়ম মেনে চলে। নানা পরিবর্তনের মাঝেও তারা ঐ নিয়মগুলি রক্ষা করেছে। যাকে প্রাণদান করা হয় তার সামনে কোনও গোপনীয় কথাও প্রকাশ করলে উভয় পক্ষেরই কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। প্রাণদাতার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কেউ দাঁড়ায়নি। ইহাই আফগান হিন্দু এবং সুন্নিদের একটা মস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বাচ্চা-ই-সাক্কোর

সম্বন্ধে এদের কাছ হতে যা শুনেছিলাম তা কথনও আফগানিস্থানে থাকার সময় কারো কাছে বলিনি। আজও পুস্তকে এই ঘটনাটি স্থান পেত না, কিন্তু আফগানিস্থান এমনই এক সময়ে আজ এসে পড়েছে যে আজ যদি আমি যা শুনেছি তা প্রকাশ করি তবে আমার প্রাণদাতাদের কোন ক্ষতি হবে না। তারপর এটাও মনে রাখতে হবে, যা বলতে যাচ্ছি তা চায়ের দোকানের গল্প।

মানুষে মানুষে ভেদ ঘুচিয়ে দেবার জন্য যিশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন, বুদ্ধ এত ত্যাগ স্বীকার করলেন, নানক সকল ধর্ম মিলিয়ে নতুন ধর্ম তৈরী করলেন, কিন্তু মানুষ সমান স্তরে এল না। মানুষের মাঝে ছোটজাত বড়জাত রয়ে গেল, ছোটলোক বড়লোক রয়ে গেল। বাচ্চা-ই-সাক্কো ছোট জাত। তাঁর অস্তিত্বের দরকার ছিল। যখন দেখা গেল বাচ্চা-ই-সাক্কো হবিব উল্লা হয়ে পুঁজিবাদী এবং উঁচু জাতকে আর্থিক জগতে ছোট করছে তখনই আবার উঁচু জাতের মাথা ঘুলিয়ে গেল, নাদির সাহের দরকার হল।

বাচ্চা-ই-সাক্কো আট মাস রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব সময়ে আফগানিস্থানের কি অবস্থা ছিল সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেননি। আমি পর্যটক মাত্র। ইতিহাস লিখবার জন্য সে দেশে যাইনি। সে দেশের লোকও বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে তখন অনেকটা নীরব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গোপনে যারা বাচ্চা-ই-সাক্কোর সম্বন্ধে কথা বলত তাদের কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগত। যারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, বাচ্চা-ই-সাক্কো এদেরই সমশ্রেণীর লোক। কুহীস্থান নামক যায়গা হতে এরা কাবুলে এসে বসবাস করছে। কুহীস্থানই বাচ্চা-সাক্কোর জন্মস্থান। বাচ্চা-ই-সাক্কো হিলজাই সম্প্রদায়ের লোক।

কাংড়া জেলা নিবাসী চেলারাম গত মহাযুদ্ধের চাকুরি শেষ করে,

তৃতীয় আফগান যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। আফগান যুদ্ধ শেষ হলে তাঁকে খারিজ করা হয়। তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে এসে বেশিদিন তিনি থাকেন নি। ফের আফগানিস্থানে চলে যান। আফগানিস্থানে যাবার পর তাঁর মতিগতি ভাল ছিল না। কোনও কারণবশতঃ তাঁকে জেলে যেতে হয়। আমান উল্লা রাজত্ব করতেন বলেই চেলারাম বিকলাংগ না হয়েই জেলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও আফগানিস্থানে চোরের হাত কেটে ফেলা হয়।

আমান উল্লা সমাজ সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। জেল-সংস্কার করবার তাঁর ফুরসত হয়নি। তখন জেলে গেলে কয়েদীদের বার হতে খাদ্য সংগ্রহ করে আনতে হত। এখনও সে নিয়ম আছে বলেই মনে হয়, তবে গত চার বৎসরের সংবাদ আমি সঠিক জানি না। চেলারামও বার হতেই খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। একদিকে জেলের কাজ করা তারপর খাদ্য সংগ্রহ করে আনা ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ। বেশি পরিশ্রম করলে সুনিদ্রা হয়। একদিন সকাল বেলা চেলারাম যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার টিকি দেখে, তিনি যে হিন্দু তা অনেকেই বুঝতে পেরেছিল। হিন্দুরা খুব কমই জেলে যায়। সেজন্যই বোধহয় হিন্দুদের জেলে দেখলে অন্যান্য কয়েদীরা সকলে মিলে খামকা তার ওপর অত্যাচার করে। চেলারামকেও অহেতুক অত্যাচার করার জন্য অন্যান্য কয়েদীরা এসে একত্রিত হল। চেলারাম বুঝলেন এবার তাঁর প্রাণান্ত হবে। যখন তাঁর উপর সত্যই অত্যাচার শুরু হল তখন কাছে দাঁড়ান একটি গম্ভীর প্রকৃতির লোকের পায়ে ধরে চেলারাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। সেই লোকটিই বাচ্চা-ই-সাক্কো।

চেলারামের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। চেলারাম বুঝলেন টাকাই পরমার্থ নয়। তারপর বিদ্রোহ হল। বিদ্রোহে বাচ্চা-ই-সাক্কো

মসজিদ পেরিয়ে পাহাড়ের গায় আসামাই মন্দির (কাবুল)

অনুচরবর্গসহ বাচ্চা-ই-সাকোকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

কৃতকার্য হয়ে হবিবুল্লা নাম নিলেন। কিন্তু তাঁরও মতিগতি বদলে গেল। চেলারাম ধর্মের ফেনাটিজম আফগানিস্থান হতে তাড়াতে বদ্ধপরিকর হলেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো ছোট জাত বড় জাত দুটা কথা পৃথিবী হতে লোপ করতে উদ্যোগী হয়ে দেখলেন, এ যাবার নয়, যে পর্যন্ত রুশ দেশের পথ অবলম্বন করা না যায়। চেলারাম এবং বাচ্চা-ই-সাক্কো উভয়ে একমত হয়ে কাজে বৃত হলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। নাদীর শা এসে তাঁদের সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলেন। চেলারাম পালালেন। বাচ্চা-ই-সাক্কো ধরা দিলেন। বাচ্চা-ই-সাক্কোকে ফাঁসি দেওয়া হল। ছোট লোকের রাজত্ব আট মাসের মাঝেই শেষ হল। ইউরোপীয় লেখকগণ বলেন, বাচ্চা-ই-সাক্কোকে গুলি করে মারা হয়েছিল। আমি কিন্তু সে কথা শুনিনি। ইউরোপীয় লেখকগণ বলেছেন বাচ্চা-ই-সাক্কো উত্তর হতে এসে কাবুল আক্রমণ করেছিলেন। আমি শুনেছি বাচ্চা-ই-সাক্কো জেল থেকে বের হয়ে বিদ্রোহ করেন।

বাচ্চা-ই-সাক্কোর জীবন-চরিত শ্রবণ করে মন্দিরে ফিরে আসতে হল কারণ সন্ধ্যার পর আর প্রধান মন্ত্রীর বাড়ি যাওয়া চলে না এবং এত শীতের মাঝে পথে চলাও অন্যায় কাজ। আসামাই মন্দিরে ফিরে গিয়ে পূজারীকে সেদিনকার বিপদের কথা বলাতে পূজারী সুখী এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে এবারের মত। পাঠানরা কিন্তু হিন্দুদের মোটেই সাহায্য করে না। পূজারীর কথা শুনে মনে মনে বেশ একটু হাসলাম।

সাহায্য না করারই কথা। অতীত যুগ হতে এদেশের নীচ জাতের প্রতি এরাই অর্থাৎ তথাকথিত অভিজাতরাই অত্যাচার করেছে বেশি। ধর্মের দিক দিয়েও কত পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এদের প্রতিপত্তির অবসান হয়নি, গরিবের উপর অত্যাচারের

উপশম হয় নি। এখানে আমি হিন্দু মুসলমানের কথা ভুলেই গিয়েছিলায়। আমি ভাবতাম অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতের কথা।

পরদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই ইচ্ছা হল একবার স্থানীয় সবজি মণ্ডি দেখে আসি। উদ্দেশ্য এখানে মাছ কি দরে বিক্রি হয় তা দেখব। যদি মাছ কিনতে পাই তবে কোন পাঠানের দোকানে নিয়ে গিয়ে তা ভেজে দিতে বলব এবং আরাম করে খাব। মাছ ভাজা খাবার প্রবল ইচ্ছাই আমাকে সবজি মণ্ডির দিকে টেনে নিয়ে গেল।

সবজি মণ্ডির বাইরে একস্থানে কএকটি লোক কতকগুলি মাছ বিক্রি করছিল। মাছগুলি দেখতে বড়ই কুৎসিত। মনে মনে তখন সমাজতত্ত্বের কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি কারণে বলতে পারি না আপনা হতেই মুখ হতে গুণ গুণ স্বরে একটি গান বের হয়ে এল। সেই গানটি হল আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। হঠাৎ অদূরে বোরখা পরিহিত একজন নারী দাঁড়ালেন। মনে হল যেন তিনি আমার গান শুনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান হতে তিনি ইংগিতে আমাকে নিকটে ডাকলেন। আমি নিকটে গেলে বোরখার ভেতর হতেই তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আফগানিস্থানে কাবুল শহরের বুকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় একটি নারীকে কথা বলতে দেখে আমার ভারি বিস্ময় বোধ হল। তাঁর কথা শুনে তাঁকে বাংগালী ভদ্রঘরের মেয়ে বলেই মনে হল। তিনি আমাকে যতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার সকল কথারই উত্তর দিলাম। আমার কথা শুনে তিনি ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন তিনিও বাংগালী। কাবুলের মত স্থানে একজন বাংগালীর সংগে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি খুব খুশী হয়েছেন। ঘটনাচক্রে কাবুলেই তিনি বাস করেন। বাড়িতে তাঁর স্বামী এবং ছেলে মেয়ে

রয়েছে। আমাকে তিনি তাঁরই সংগে তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। আফগানিস্থানে অপর স্ত্রীলোকের পেছন পেছন চলা বড়ই অন্যায় কাজ। আমার মনে কোনরূপ বদবুদ্ধি ছিল না। কাবুলের মত স্থানে একটি বাংগালী নারীর দর্শন পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হয়েছিল। আমি কোনরূপ চিন্তা না করেই তাঁর কথায় সম্মত হলাম। তিনি আগে আগে চললেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনটি সরু গলি ঘুরে আমরা একটি বাড়ির সামনে এলাম। তিনি কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। একটি বার তের বৎসরের মেয়ে ও একটি আট বৎসরের ছেলে বের হয়ে এল। তাদের মায়ের সংগে একজন অপরিচিত লোক দেখে তারা বিস্মিত হল। তাদের মা তাদের ডেকে কি বললেন। তারা একটু ভয়ে ভয়ে সংগে চলল।

উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম, একজন পাঠান বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি খুশী হয়েছেন বলে মনে হল না। যা হোক তিনি ভদ্রতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেন নি। "স্তারেমাসে" বলে তিনি আমাকে সম্ভাষণ করলেন। উত্তরে আমি নমস্কার বলতে তিনি কিছু বিস্মিত হলেন। তারপর তিনি হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমিও হিন্দুস্থানীতে তাঁর কথার জবাব দিতে লাগলাম। আমার পরিচয় পেয়ে এবং আমি যে একজন "সাইয়া চুনিয়া" তা শুনে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে একটি নতুন টি-পট, এক ঘটি গরম জল এবং কতকগুলি চায়ের পাতা সামনে এনে দিয়ে চা বানিয়ে খেতে বললেন। আমি হেসে বললাম নতুন টিপটের কোন দরকার নেই। আমি হিন্দুকুলে জন্মেছি বটে, তা বলে হিন্দুদের আদিম যুগের জাতিভেদ মানতে কোন মতেই রাজি নই। ছুতমার্গ আমার মাঝে নেই। আমার কথা শুনে সরলচিত্ত পাঠান অত্যন্ত খুশী

হলেন এবং তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করলেন। তাঁর ছেলেকে কি বলে তিনি আমার সংগে কথাবার্তা শুরু করলেন। বাংগালীরা দুধ ছাড়া চা খায় না, সেজন্য তিনি তাঁর স্ত্রীকে দুধ আনতে পাঠিয়েছিলেন। কথায় কথায় বললেন, মেওয়া বিক্রি করতে প্রত্যেক বৎসরই তিনি আমাদের দেশে আসেন। আঠার বৎসর পূর্বে তিনি লক্ষ্মীকে কলকাতায় বিয়ে করেছিলেন। লক্ষ্মী বাংগালীর মেয়ে, তিনি লক্ষ্মীকে চুরি করে আনেন নি। হিন্দুমতে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। এদুটিই তাদের ছেলে মেয়ে। তাঁর স্ত্রী বাংগালী বলেই তিনি বাংগালীকে ভালবাসেন। সুজলা সুফলা বাংলা দেশের একটি কোমলাংগী বধু শুষ্ক কর্কশ নিকট পাঠান-গৃহকে আপন করে নিয়েছে—কথাটা ভাবতেও মনে একটা বিস্ময় লাগছিল।

আমি ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে নিয়ে এলাম। এবার তাদের একটু সাহস হয়েছে। তারা ভয় না করে আমার কাছে এল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের সংগে আমি কথা বলতে পারিনি। তারা জানত শুধু পোস্ত ভাষা। এ সময়ে লক্ষ্মী ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। এবার তাঁর পরনে খাঁটি বাংগালী মেয়ের পোশাক। তাঁর শাড়ি পড়া দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। দেখলাম পাঠানের চোখেমুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

এবার পাঠান-স্বামী লক্ষ্মীর সংগে আমার সম্বন্ধ করে দিলেন। তিনি ভাংগা ভাংগা বাংলাতে স্ত্রীকে বললেন, ইনি তোমার দাদা, একে অভিবাদন কর। সত্যই লক্ষ্মী যখন বাংগালী মেয়ের মত আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলেন তখন নিমেষে আমার মনে বাংলা দেশের গৃহচ্ছবি ভেসে উঠল। লক্ষ্মীর মধ্যে যেন সমস্ত বাংলা দেশ মূর্ত হয়ে উঠল। লক্ষ্মী আমার জন্য চা প্রস্তুত করবেন কি না ইতস্তত করছেন

দেখে তাঁর পাঠান স্বামী হেসে উঠলেন। তিনি তাকে আশ্বাস দিয়ে চা বানাতে বললেন। লক্ষ্মী যত্ন সহকারে চা বানিয়ে রুটির সংগে আমাকে চা দিলেন। তারপর তাঁর নিজের কথা বলতে লাগলেন।

লক্ষ্মীর সংগে বাংলাতেই আমি কথা বলতে লাগলাম। পাঠানকে বললাম, ভাই, বাংগালী বোনের সংগে আমি নিজের ভাষায়ই কথা বলব। এতে তুমি নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে না। পাঠান বললেন, তুমি বাংলাতে কথা বল এতে আমার আপত্তি নেই। আমি বাংলা একটু আধটু বলতে পারি। কিন্তু তোমার বোন আমাকে ভাল করে বংলা শেখায়নি সেজন্য আমি দুঃখিত। যখনই আমি কলকাতা যাই তখনই অনেক চেষ্টা করে তোমার বোনের জন্য বাংলা কেতাব কিনে আনি। তুমি ইচ্ছা করলে এসব কেতাব দেখতে পার।

কথা বলতে বলতে লক্ষ্মী তাঁর পুস্তকের ভাণ্ডার আমার সামনে ধরলেন। দেখলাম তথায় কাশীদাসের মহাভারত, টেকচাঁদের গ্রন্থাবলী, সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়, বংকিম চন্দ্রের চন্দ্রশেখের, যুগলাংগরীয়, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, লোকরহস্য, পুরাতন কএকখানা প্রবাসী এবং নব্য ভারত রয়েছে। বইগুলি দেখে মনে বেশ আনন্দ হল। বুঝতে পারলাম যদিও পাঠানের বহিরাবয়ব কর্কশ তবু তাঁর অন্তর কোমল। লক্ষ্মীকে তিনি প্রকৃতপক্ষেই অন্তরের সহিত ভালবাসেন। লক্ষ্মীকে সুখী রাখবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করে থাকেন।

লক্ষ্য করলাম, লক্ষ্মীর মনে প্রথমই ছুৎমার্গের ভাব এসেছিল। তিনি বললেন যদিও তিনি পাঠানকে বিয়ে করেছেন তবুও তিনি মনে প্রাণে হিন্দুই আছেন। আজও তিনি অখাদ্য কিছুই খাননি। নিজেই পাঁঠা অথবা দুম্বার মাংস কিনে আনেন। মাছ যা পাওয়া যায় তার দাম বেশ সস্তা।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও ব্রাহ্মণত্ব যদিবা হটিয়ে দিতে পেরেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের পেটুকত্ব চেষ্টা করেও তাড়াতে পারি নি। মাছের কথা শুনতেই আপনি মুখে জল এল। লক্ষ্মী বললেন একদিন মাছ রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন। কিন্তু তত সময় অপেক্ষা করা আমার সহ্য হল না। বললাম, পরের কথা পরে হবে, এখন ঘরে যা আছে তা দিলেই খুশী হব।

আমার কথা শুনে লক্ষ্মী হেসে ফেললেন এবং পাঠানকে কি বলে বাইরে চলে গেলেন। পাঠান তখন আবার আমার সংগে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, স্থানীয় ইলেক্ট্রিক কোম্পানীতে একজন বাংগালী সাহেব কাজ করেন তাকে অনেক দিন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি কখনও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নি। লক্ষ্মী বাংগালীর সংগ পছন্দ করে, আমি বাংগালীর সংগে মেলা মেশা করতে চাই, কারণ এতে আমার ইজ্জত বাড়ে। কিন্তু ঐ ছোট লোক একদিনও আমার বাড়ি আসেনি। তুমি ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মী শূদ্র, তোমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রের রান্না খায় না তা আমি জানি। তুমি কি লক্ষ্মীর রান্না খাবে? আমি উচ্চস্বরে হেসে বললাম, প্রচলিত ব্রাহ্মণত্ব যা আছে তাতে আমার আস্থা নেই। মানুষ কৃত্রিম জাতের ছাপ তাদের কপালে মেরে দিয়েছে, আমি এসব কৃত্রিমতা ভালতো বাসিই না, যদি সময় আসে তবে এসব কৃত্রিমতা সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা করব।

আমার কথা শুনে পাঠান বড়ই সুখী হলেন এবং পরের দিন তাঁর বাড়িতে খাবারের নিমন্ত্রণ করলেন। ইতিমধ্যে লক্ষ্মী থালায় ভাত এবং বাটিতে তরকারী সাজিয়ে নিয়ে এলেন। ছোলার ডাল, পাঠার মাংসের ঝোল এবং প্রচুর আচার ছিল। বহুদিন পর বাংগালী বোনের দেওয়া ডাল ভাত খেয়ে তৃপ্ত হলাম। সন্ধ্যা হবার সংগে সংগেই

আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। বেশি দেরি করা অন্যায় হবে ভেবে কুড়িয়ে-পাওয়া বোনের ঘর পরিত্যাগ করে সত্বর আসামাই মন্দিরে ফিরে এলাম।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই পাঠান ভগ্নীপতির মুখদর্শন হল। মুখ হাত ধুয়েই তাঁর সংগে চললাম। পথে চলতে চলতে কলকাতার সম্বন্ধে অনেক বিষয় বলে তিনি আমার মনে কলকাতার একটি চিত্র এঁকে তুলতে লাগলেন। বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখি লক্ষ্মী এবং ছেলেমেয়ে দুটি বাজারে যাবার জন্য কাপড় পরে প্রস্তুত হয়েছে। আমাকে চা-রুটি দিয়েই তারা বাজারে যাবে ঠিক করেছিল। আমি কিন্তু তাতে রাজি হলাম না। ওদের সংগে বাজারে যেতে আমারও ইচ্ছা হল। কিন্তু পাঠানদের নিয়ম অন্য রকমের। অতিথিকে বাজারে গিয়ে কিছু কিনে আনতে নেই। আমি নাছোড়বান্দা। বললাম যে আমিও বাজারে যাব এবং আমার যা ভাল লাগে তা কিনতে বলব। তিনি হেসে সম্মতি দিয়ে বললেন, ভাই বোন এক সংগে বাজারে যাবে তাতে আপত্তি কি?

লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমি বাজারে গেলাম। পথে লক্ষ্মীকে বললাম, বাজারে গিয়ে আমার এক পয়সাও খরচ করা পাঠানদের মতে মহাপাপ, কিন্তু বোনকে যদি আমি আমার ইচ্ছামত কিছু জিনিস কিনে দিই, তাতে কার কি থাকতে পারে? আমার বোন ছিল তারা মরেছে। আজ তুমিই আমার বোন। তোমাকে এবং তোমার ছেলেমেয়েকে কিছু কিনে দিলে আমার শান্তি হবে। লক্ষ্মী তাতে কোন আপত্তি করল না। প্রথমত আমি ছেলেমেয়ে দুটিকে কিছু খেলনা কিনে উপহার দিলাম। মামার নিকট হতে উপহার পেয়ে তাদের বেশ আনন্দ হল। খাবারের জন্য দুটি জংলী হাঁস এবং অন্যান্য কিছু আহার্য কিনে ফিরে এলাম।

লক্ষ্মীর সংগে আমাকে বাজারে দেখে অনেকেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করছিল। লক্ষ্মী তা বুঝতে পেরে ছেলেমেয়ের কানে কি বলে দিলেন। লক্ষ্মীর ছেলে মেয়ে মার কথা শুনে আমাকে পোস্ত ভাষায় মামা বলে ডাকতে লাগল। অনেকেই ওদের আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। ছেলেমেয়েরা বলেছিল ইনি কলকাতার মামা। এদের হাবভাব দেখে মনে হল কলকাতার লোককে মামা বলে ডাকা অসম্মানের নয়।

বাড়ি ফিরে লক্ষ্মী রান্নার বন্দোবস্ত করলেন। আমি তাঁরই কাছে বসে কথা বলতে লাগলাম। রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কুমারী জীবনের কথা তিনি আমার কাছে বলে যেতে লাগলেন। লক্ষ্মী নিজের ইতিহাস যা বলেছিলেন তা এখানে বলছি। এখানে যে সমস্ত নামের উল্লেখ করছি তা সবই কল্পিত।

পূর্ববংগের কোন এক জেলায় লক্ষ্মীর পৈতৃক নিবাস। পিতা হরিশংকর রায় সদরে চাকুরি করতেন। হরিশংকরের মাইনে সামান্যই ছিল। সেজন্যই বোধহয় স্ত্রীকে চাকুরিস্থলে রাখতে সক্ষম হতেন না। স্ত্রী একা বাড়িতেই থাকতেন। যখনই হরিশংকর সুযোগ পেতেন তখনই বাড়ি এসে সংসারের দেখাশুনা করতেন, তারপর আবার সদরে চলে যেতেন। তাঁদের গ্রামের ব্রাহ্মণপুত্র কালু পণ্ডিত লোক ভাল ছিলেন না। তিনি দরিদ্র হরিশংকরের স্ত্রীর নামে নানা কুৎসা প্রচার করতেন। কিছুদিন পর হরিশংকরের স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। লক্ষ্মীর জন্ম হল। তখন কালু পণ্ডিত গ্রামের মাঝে এমন হৈ চৈ শুরু করলেন। দরিদ্র হরিশংকর ধনী ব্রাহ্মণ কালু পণ্ডিতের দ্বারা একঘরে হলেন। কালু পণ্ডিতের কাছে অনেকেই ঋণের দায়ে দায়ী, সেজন্য ঋণগ্রস্ত গ্রামবাসী হরিশংকরের দোষগুণ না দেখেই তাকে সমাজচ্যুত করল।

দরিদ্র হরিশংকরের পক্ষে ইহা সহ্য করা সম্ভব হল না। তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং স্ত্রী ও কন্যার দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। লক্ষ্মীর মা বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি সবই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রবল শত্রুর সংগে বিবাদ করে গ্রামে বাস করা অসম্ভব। তাই তিনি তাঁর এক দূরসম্পর্কিত ভগ্নীর কাছে কলকাতায় চলে এলেন।

লক্ষ্মীর মা কলকাতা এলেন, কিন্তু কালু পণ্ডিত তার সংগ ছাড়ল না। সে নানা চেষ্টা করে লক্ষ্মীর মার ঠিকানা বের করল এবং কলকাতায় চলে এল। যখনই সে সুযোগ পেত তখনই লক্ষ্মীর মার নিকট উপস্থিত হত এবং তাঁর কাছে কুপ্রস্তাব করত। একদিন লক্ষ্মীর মার অসহ্য বোধ হওয়ায় তিনি সুপারী কাটার যাঁতি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। ধনগর্বে গর্বিত কালু ব্রাহ্মণ চলে গেল কিন্তু অপমান ভুলেনি।

একদিন লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে মুদির দোকানে ঘি কিনতে পাঠিয়েছিলেন। লক্ষ্মী আর ফিরে আসেনি। লক্ষ্মীর মা তাঁর সাধ্যমত খোঁজাখুঁজি করলেন কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। কিছুদিন পর তিনি সংবাদ পেলেন যে কালু পণ্ডিত লক্ষ্মীকে চুরি করে ঢাকাতে নিয়ে রেখেছে। লক্ষ্মীর মা অতি কষ্টে ঢাকা গেলেন। তথায় কালু পণ্ডিত এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিল। ঘটনাচক্রে এক সহৃদয় মুসলমান ভদ্রলোকের সংগে লক্ষ্মীর মার পরিচয় হয়। তাঁর সাহায্যেই তিনি কালু পণ্ডিতের কবল থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করেন। বহুদিন পর লক্ষ্মীর মা মেয়েকে কোলে পেয়ে কলকাতা ফিরে এলেন। এর ক মাস পর কালু পণ্ডিত ইহধাম পরিত্যাগ করেন। গ্রামের লোক তার অন্তর্ধানে সুখী হল বটে কিন্তু কালু পণ্ডিতের দুর্দান্ত ছেলে

অমলকৃষ্ণ মুখার্জ্জি তার পরিত্যক্ত গদি পেয়ে পিতার চেয়েও দোর্দাণ্ড প্রতাপে গ্রামের উপর আধিপত্য করতে লাগল।

দেখতে দেখতে বৎসর কেটে যেতে লাগল, লক্ষ্মীর বিয়ের বয়স হল। লক্ষ্মীর মা স্বামীকে জানালেন, চিঠির পর চিঠি দিলেন কিন্তু কোন ফল হল না। ঢাকার সেই মুসলমান ভদ্রলোককে লক্ষ্মীর মা দাদা বলে ডেকেছিলেন। দাদাকে লক্ষ্মীর বিয়ের জন্য অনুরোধ করলেন। দাদা জানালেন তাঁর হাতে একটি উপযুক্ত বর আছে, তাকে তিনি কলকাতা সংগে করে নিয়ে আসবেন। কএকদিন পর বরকে সংগে করে মুসলমান ভদ্রলোক কলকাতা এসে উপস্থিত হলেন। বরের চেহারা দেখে কেমন কেমন সন্দেহ হল, কথাও ভাংগা ভাংগা, তবে বর নাকি ছোট বেলায় পেশোয়ারে ছিল। দুঃখিনীর মেয়ের বিয়ে, বেশি ভাবনা করার সময় ছিল না। হিন্দু মতে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেল। বর তাকে নিয়ে ঢাকা চলে গেলেন। কিন্তু ঢাকার পথ আর শেষ হয় না। লক্ষ্মী অবশেষে বুঝলেন তিনি পাঠান মুল্লুক কাবুলে এসেছেন।

এ পর্যন্ত বলে লক্ষ্মী স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, এ লোক খারাপ নয়। আমাকে বিশেষ জ্বালাযন্ত্রণা দেয়নি। তবে প্রথম কিছুদিন অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রার সংগে আপোষ করতে বেগ পেতে হয়েছিল। কি যে নিদারুন কষ্টে আমার দিন গিয়েছে। তারপর যতই দিন যেতে লাগল ততই অদৃষ্টকে মেনে নিতে বাধ্য হলাম। এ দুটি ছেলেমেয়ে জন্মেছে, এখন আমার বিশেষ কিছু কষ্ট নেই। কিন্তু এ দেশে থাকতে মোটেই আমার ইচ্ছা হয় না। আমরা কি দেশে গিয়ে হিন্দুসমাজে মেশবার সুযোগ পাব?

লক্ষ্মীর কথা শুনতে শুনতে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। স্থান কাল ভুলে গিয়েছিলাম। লক্ষ্মীর প্রশ্নে চমক ভাংল।

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভিন্ন ভিন্ন তরকারি পাক করে লক্ষ্মী আমাকে খেতে দিলেন কিন্তু আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই দূর হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীর কথা থেকে থেকে আমার অন্তরে বেজে উঠছিল। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে আমি সেদিনের মত বিদায় নিলাম। তারপর যে কদিন আমি কাবুলে ছিলাম দুঃখিনী ভগ্নীকে ভুলিনি। কাবুল হতে বিদায় নেবার সময় লক্ষ্মীর পাঠান-স্বামী 'মটরে পোস্তে' এসে পথে খাবারের জন্য আমাকে অনেক রকম ফল দিয়ে গিয়েছিলেন।

সমাজের পাপে, সমাজের দুর্বলতায়, বাংলার কত লক্ষ্মী যে এরূপ ভাবে দিন কাটাচ্ছেন—কে তার সংখ্যা গণনা করবে? কে তার জন্য দায়ী?

সকালবেলা হতেই তুষারপাত শুরু হয়েছে। সারাদিন ঘরে বসেই কাটাতে হল। তুষারপাতকে উপেক্ষা করেই কএকজন হিন্দু এবং মুসলমান আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ভ্রমণ-কাহিনী শোনার জন্য তাঁরা আমার কাছে আসেন নি, তাঁরা এসেছিলেন আসামাই মন্দিরে ঘোল ঢালতে এবং আমার নিকট থেকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য কবচ নিতে। আগন্তুকদের ধারণা আসামাই মন্দিরের কোনও বিশিষ্ট স্থানে ঘোল ঢাললেই বসন্ত রোগ হতে রোগী বেঁচে যাবে। তাদের আরও ধারণা ছিল, যারা দেশ ভ্রমণ করে তারা কবচ তাবিজ দিয়ে থাকে। এদের ভুল বিশ্বাস ভাংতে গিয়ে আমাকে বড় দরের একটা চোট সামলাতে হল। পূজারী আমাকে বললেন, আপনি দেখছি এখানে বসেই মন্দিরের অবমাননা করতে শুরু করেছেন। আসামাই জাগ্রত গংগা। শ্রীকৃষ্ণ এই গংগাজলকেই কলিযুগের মুক্তির বাহন বলে গিয়েছেন। এখানে ঘোল ঢেলে কত বসন্ত রোগী আরাম পেয়েছে তার হিসাব রাখেন? আপনি হয়তো কবচ দেবার শক্তি

অর্জন করেন নি, কিন্তু যারা কবচে বিশ্বাস করে তাদের বিপথগামী করা আপনার পক্ষে অন্যায়, এবং এরূপ করলে এখানে আপনি থাকতে পারবেন না। আমি চুপ করে থেকে পুঁজিবাদী পরিচালিত অর্থনীতির কথা ভাবতে লাগলাম, এবং মনে মনে ঠিক করলাম আজই সুযোগ পেলে টাকার যোগাড় করে এখান হতে সরে পড়ব।

দুই

বেলা তখন চারটা। আকাশ পরিষ্কার। প্রবল হাওয়া বইছিল। তারই মাঝে অতিকষ্টে, মাঝে মাঝে চাএর দোকানে, নাপিতের দোকানে গিয়ে শরীরটাকে গরম করে পথ চলে প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হলাম। দরজায় দুটি তুর্কীস্থানের পাঠান পাহারা দিচ্ছিল। এদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সদর দরজা পেরিয়ে গেলাম। মনে মনে শোলা-হ্যাটটিকে নমস্কার করলাম। কোনও এক সময়ে ইউরোপীয়ানরা বোখারায় শোলা হ্যাট ব্যবহার করত। এসব ইউরোপীয়গণ সাধারণত কূটনীতিক কাজেই আসতেন। সুলতানের প্রাসাদে তাঁদের অবাধ যাতায়াত ছিল। এ দুটি সান্ত্রীও বোধ হয় আমাকে সেরূপ একজন কূটনৈতিক ভেবেই ছেড়ে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় দরজাও সেরূপ ভাবে গম্ভীরভাবে পার হয়ে চলে গেলাম। দ্বিতীয় দরজার সান্ত্রী হয়তো ভেবেছিল প্রথম দরজায় 'পাস' দিয়ে এসেছি। তারপর এল একটা প্রাংগন। এখান থেকে দুদিকে দুটা পথ চলে গিয়ে প্রধান মন্ত্রীর খাস দরজায় গিয়েছে। আমি ডানদিকের পথ ধরে ডান-বাঁ না তাকিয়ে সেক্রেটারীর দরজায় উপস্থিত হলাম। পথে চলার সময় লক্ষ্য করলাম দোতলার একটা ঘরের তিন দিকের

এবং তেতলার সবদিকের দেয়ালই কাঁচের। আরও লক্ষ্য করলাম তেতলার ঘরটাতেই অনেক লোক বসে আছেন, অনেকে দাঁড়িয়েও আছেন।

সেক্রেটারি বেশ ভাল ইংলিশ জানতেন। তাঁর সংগে ইংলিশেই কথা হল। প্রধান মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করতে এসেছি জানালে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি নামগোত্রহীন একজন ভবঘুরে বলায় তাঁর মুখে যেন একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। তবুও ভদ্রলোকটি ভালো মানুষ বলতে হবে। তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে জেনে আসতে গেলেন আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সময় হবে কি না। আমি জানতাম, আমার মত অবিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করার কোন বড় লোকেরই সময় হয় না। আমার মত লোক তাঁদের কাছে পৌঁছলেই তাঁদের কাজের হিড়িক লেগে যায়। ভাবছিলাম আমার কাছে যে পরিচয়পত্রখানা আছে তা সেক্রেটারীর হাতে দেওয়া যায় কি না, এমনি সময় সেক্রেটারি এসে জানালেন প্রধান মন্ত্রীর সময়ের বড়ই অভাব, তিনি দুঃখের সহিত জানাচ্ছেন যে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হবে না। সেক্রেটারির হাতে পরিচয়-পত্রখানা দিয়ে বললাম, এখন একবার আপনি ওপরে যান, এখন হয়তো আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে তাঁর সময় হতে পারে। সেক্রেটারি কাগজখানা খুলেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। দু হাত দিয়ে বেল বাজাতে লাগলেন যেন ঘরে আগুন লেগেছে। তিনজন চাকর এসে হাজির হল। তাদের আমার খিদমত করার জন্য লাগিয়ে দিয়ে তিনি উপরে চলে গেলেন এবং কএক মিনিটের মাঝেই নিচে নেমে এসে আমাকে হাত ধরে প্রধান মন্ত্রীর সকাশে হাজির করলেন।

প্রধান মন্ত্রী বাদশাহী চালে সফার উপর বসে ছিলেন, ভাবছিলেন

হয়তো আমিও সেই শ্রেণীরই পর্যটক অথবা দর্শনপ্রার্থী হব যারা এখনও কুর্ণিশ করে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করে। আমি তাঁকে ছোট্ট একটা নমস্কার মাত্র করলাম।

যে পরিচয়পত্রটি এতখানি আশাতীত সুফল প্রসব করল, সেখানি মন্ত্রী মহাশয়েরই এক নিকট আত্মীয়ের দেওয়া ছিল। তিনি চীনের হারবিন শহরে বাস করতেন। মন্ত্রী মহাশয় প্রথমত আত্মীয়ের সংবাদাকি জেনে নিলেন।

তারপর উভয়ের মাঝে অনেকক্ষণ দেশ-বিদেশের নানা কথা হয়। প্রধান মন্ত্রী আমাকে রাজকীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরূপে স্বীকার করে নিলেন এবং কাবুল হতে হিরাত পর্যন্ত ভ্রমণের সকল রকম সুবিধা করে দিলেন। কাবুলে কাবুল হোটেলে থাকবার জন্য তিনি আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজি হইনি। আসামাই মন্দিরেই থাকা ভাল হবে বললে তিনি তৎক্ষণাৎ বৈদেশিক আফিসে নির্দেশ দিলেন আসামাই মন্দিরে থাকতে আমার যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার যেন বন্দোবস্ত করা হয়। আমিও সেদিনের মত নিশ্চিন্ত মনে আসামাই মন্দিরে ফিরে এলাম।

পৃথিবীতে মানুষের প্রচারিত যত ধর্ম আছে, তার স্থায়িত্ব রাজশক্তির সাহায্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। রাজ-আজ্ঞা অনেক সময় ধর্মের প্রচলিত বিধি-নিষেধকেও ডিঙিয়ে যায়। পাথরের দেবতা অপেক্ষা রাজশক্তি অধিকতর জাগ্রত বলে ধার্মিকরাও রাজাজ্ঞা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হন। আসামাই মন্দির হিন্দুর। আমি মন্দির হতে বহিষ্কৃত হতে চলছিলাম, কিন্তু রাজকৃপায় আমি আসামাই মন্দিরেই মন্দিরের বিগ্রহের মতই পূজ্যপাদ হয়ে বাস করবার অধিকার পেলাম। পূজারী যখন দেখল বৈদেশিক সচিবের আফিস হতে লোক

এসে আমার সুখসুবিধার তত্ত্বতাবাস করছে, এবং জনরব রটেছে হয়তো রাজা জাহির শা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন, তখন সে ধরে নিল আমি একটা যে-সে লোক নই, নিশ্চয়ই একটা উঁচু দরের কিছু হব।

লোক দেবতার পূজা করে না, পূজা করে দেবতারূপী ভয়কে। ভক্তি হল ভয়ের একটা অংগ। ভক্তিভরে পাথরের দেবতার চরণসেবা করি কেন? অন্তিমে সুখ শান্তি পাব বলেই। পেছনে রয়েছে নরকের চিত্র। সেই চিত্রই দেখিয়ে দেয় স্বর্গের সুখশান্তি। কল্পিত নরক যদি না সৃষ্টি করা হত, তবে কল্পিত স্বর্গের সৃষ্টিও মানুষের দ্বারা হত না। আমি যদিও পূজারী ঠাকুরের কাছে মূর্তিমান নরকসদৃশই ছিলাম তবু তার পেছনে রয়েছে স্বর্গ অর্থাৎ রাজকৃপা। সেজন্যই পূজারী আমার প্রতি মনে মনে ঘৃণার ভাব পোষণ করলেও বাইরে দেবতার মতই ভক্তি করতে লাগলেন।

আমার এবার আর্থিক দুর্গতির অবসান হয়েছে দেখে মনে হল আবার নগরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চাই। আমি এখানে পেট মোটা করার জন্য আসিনি। আমি এসেছি কাবুল শহর দেখতে। কাবুলের কথা ভারতের লোক অতি অল্পই অবগত আছে। যতটুকু জানবার সুবিধা হয় ততটুকুই জেনে নেওয়া কর্তব্য।

পরদিন যখন বার হব, এমন সময় পূজারী এসে বললেন, আপনার একাকী পথে বের হওয়া উচিত হবে না, আপনার সংগে লোক থাকা চাই। লোক সংগে থাকলে সর্বসাধারণ আপনাকে সম্মান করবে। তাঁকে জানালাম আমার লোকের দরকার নেই। মনে মনে ভাবলাম, আমার আবার ইজ্জত! আমার দেশ পরাধীন, আমরা দাসখত লিখে দিয়েছি। এরূপ পরাধীন জাতের লোকের পক্ষে ইজ্জতের ভয় করা

মূর্খতা ছাড়া আর কি হতে পারে। আর কোন কথা না বলে আমি একাই বের হয়ে পড়লাম।

আমি চলেছি বৃটিশ কনসালের বাড়ির দিকে। বৃটিশ কনসালের সংগে আমার একটু দরকার ছিল। পথ বরফে ঢাকা। সাদা বরফের ওপর স্থর্যের কিরণ পড়ায় চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। আমার চোখে রংগিন চসমা থাকায় বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু খালি চোখে এরূপ অবস্থায় বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে অন্ধ হবার জোগাড় হয়। পাঠানরা অনেকেই সেজন্য পাগড়ির পেছনের ঝুলান কাপড়টা দিয়ে চোখ ঢেকে পথ চলে।

বিদেশে যাবার পর বৃটিশ কনসালের সংগে দেখাসাক্ষাত করতে আমার মোটেই ইচ্ছা হত না, কারণ প্রায় স্থলেই আমাকে দেখাসাক্ষাত করতে গিয়ে অপমানিত হতে হয়েছে। তবে সফিয়া, তেহারান, কবি, সানফ্রানসিসকো এই কটি স্থানের বৃটিশ কনসালগণ আমাকে আপন লোকের মতই ব্যবহার করেছিলেন। কেন যে তাঁরা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছিলেন তার কারণ আমার অজানা নয়। কারণটি হল তাঁরা অন্তরে কমিউনিস্ট ভাব পোষণ করতেন। এই পৃথিবীতে যারা কমিউনিস্ট ভাব পোষণ করে তাদের কারো দ্বারা আমি অপমানিত হইনি, নিগৃহীত জাতের লোক বলে তাদের কাছ থেকে সহানুভূতিই পেয়েছি। চীনা বল, জাপানী বল, জার্মান বল আর আমেরিকানই বল, যদি সে ন্যাশন্যালিস্ট হয় তবে সে ভারতবাসীকে ভালবাসতে পারে না। সে ক্ষণস্থায়ী মৌখিক ভালবাসা তোমাকে দেখাবে তোমার শরীরে কত রক্ত আছে তার সংবাদ নেবার জন্য। সময় এবং স্থযোগ পেলেই সে তোমার ঘাড় মটকিয়ে রক্ত খাবে। এটা ধ্রুব সত্য।

চীন জাপান এসব দেশ ভ্রমণ করে দেশে এসে বুঝলাম এদেশের

লোক জানে শুধু সাদা চামড়ার পূজা করতে। আমারই সামনে দুহাত খুলে এদেশের ধনীরা দান করছে শুধু সাদা পর্যটকদের। কিন্তু আমি যখন আমারই দেশবাসী আমারই মাতৃভাষাভাষীদের কাছে উপস্থিত হয়েছি. তখনই তারা চেষ্টা করেছে আমার বিদ্যাবুদ্ধির ওজন করতে, তারপর চেষ্টা করেছে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দিতে; কারণ আমার বিদ্যাবুদ্ধি মোটেই ছিলনা, এখনও হয়নি। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, আমার দেশের ছাত্র- সমাজে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, হয়তো একদিন তাতে যৌবন আসবে। এই ছিল যা আমার ভবিষ্যতের আশা। কিন্তু ভারতীয় ছাত্র-সমাজ দরিদ্র। অথচ তাদেরই কাছে আমাকে হাত পাততে হত। তারা যা দিত তাতে আমার পেট ভরত না, কিন্তু আধপেটা খেয়েও যখন ভোজনের তৃপ্তির নিশ্বাস বইত, তখনই ছাত্র-সমাজের প্রতি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ আপনি বেরিয়ে এসেছে। চীনের ছাত্র এবং ছাত্রী তাদের রক্ত দিয়েই আজ চীনকে বাঁচিয়ে রেখেছে সে দৃশ্য আমি দেখেছি। তাদের শিক্ষার পেছনে স্ব স্ব উন্নতির আদর্শ নয়। দেশের স্বাধীনতা, দেশের সর্বাংগীন কল্যাণ সাধনই তাদের উদ্বুদ্ধ তরে তুলেছে।

অর্ধচন্দ্র ক্রমাগত সহ্য করে করে, দিল্লীতে পৌছে ভেবেছিলাম আফগানিস্থানে গিয়েও হয়তো সাহায্য পাব না। আফগান জাত হয়তো পর্যটক কাকে বলে তাও জানে না। কিন্তু তা বলে আমার পর্যটন বন্ধ করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

কর্মত্যাগের পর আমার যা জমানো টাকাকড়ি ছিল, তা সবই ভারতীয় বেকারদের সাহায্যার্থে দিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভুলক্রমে একটি ব্যাংকএর টাকা দান করা হয়নি। সিংগাপুর ফিরে আসবার পর ব্যাংক ম্যানেজার সংবাদপত্রে আমার সিংগাপুর আসার সংবাদ পেয়ে

আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমার হিসাবে একুশ পাউণ্ড জমা আছে বলে জানান। এবার কিন্তু আমি জমা টাকাটা আর দান করতে সক্ষম হইনি, কারণ ক্যানেডা সরকার আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীতে মানব-প্রেম বলে আর কিছুই নেই। কাজেই টাকা অপরিহার্য। সেই কথাটা প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি নামক বইএ বলা হবে। ব্যাংক ম্যানেজারকে জানিয়েছিলাম আমার গচ্ছিত টাকাটা যেন তিনি কাবুলের বৃটিশ কনসালের কাছে পাঠিয়ে দেন। কাবুলের বৃটিশ কনসালকেও ঐ সংগেই লিখেছিলাম তিনি যেন দয়া করে আমার টাকাটা আমার কাবুলে না পৌঁছা পর্যন্ত তাঁর কাছে জমা রাখেন। সেই টাকার সংবাদ নেবার জন্যই কনসাল অফিসে চলেছিলাম।

পর্যটক হয়ে নিজ দেশের গভর্ণমেণ্টের কনসাল অফিসে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। সাধারণ লোক ভাবে, লোকটা হয়তো পর্যটক নয়, একটা গুপ্তচর। যারা প্রকৃতই গোয়েন্দা তারা কনসাল অফিসের সংগে সম্বন্ধ রাখে, কিন্তু বাইরে দেখায় তাদের সংগে কনসালের কোন সম্পর্ক নেই। তুমি যে-সরকারের প্রজা, সেই সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশে গিয়ে যদি কথা বল, তাহলেও অনেক সময় স্থানীয় লোক তোমাকে গুপ্তচর বলেই ধরে নেয়। আমি এসব কথা ভাল করেই জানতাম, কিন্তু নিজে ঠিক থাকলে ভয়ের অথবা পতনের কোন কারণ থাকে না। আমি বুক ফুলিয়েই পথে চলছিলাম।

কনসাল অফিসে পৌঁছতে আমাকে পাঁচটি চায়ের দোকানে থেমে চা খেয়ে শরীর গরম করে নিতে হয়েছিল। যদিও রৌদ্র উঠছিল, তবুও প্রবল ঠাণ্ডা বায়ু ভেতরের রক্তকে পর্যন্ত শুকিয়ে ফেলছিল। কনসালের বাড়ির কাছে একটা ফাঁকা মাঠ। সেটা পেরিয়ে যখন কনসালের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম তখন আমার শরীরের

রক্ত যেন জমে গিয়েছিল। দরজা খোলা মাত্রই সোজা কনসালের ঘরে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করলাম এবং কাছের প্রজ্জলিত আগুনটার কাছে গিয়ে হাতদুটা সেঁকতে লাগলাম। আমি ভাবছিলাম ইনি কনসাল হলে কি হবে, মানুষ তো, আমিও মানুষ। কিন্তু শীঘ্রই বুঝলাম তাঁর চক্ষে আমি মানুষ নই, এমনকি কুকুর বিড়ালও নই, গরুগাধাও নই, আমি একটি বনমানুষ,—যাকে হত্যা করলে ফাঁসিতে চড়তে হয় না, শুকিয়ে মারলে কেউ কিছু বলবার অধিকার রাখে না, গুলি করে মারলে চার পয়সা দামী বুলেটের জন্যই লোকে আপশোষ করে। কনসাল মহাশয় আমাকে বললেন, টাকা এসেছিল, তা তিনি ফেরত দিয়েছেন এবং এই প্রজ্জলিত আগুনটি তাঁরই ব্যবহারের জন্য, গুড বাই, অর্থাৎ চলে যাও। আমি কি আর বলব। মানুষতো নই, মুখে ভাষা তো নেই, অবনত মস্তকে যখন কনসালের ঘর হতে বের হয়ে আসছিলাম তখন কএকজন পাঞ্জাবী মুসলমান, যারা কনসালের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল, তারা এসে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? আমি নির্বাক হয়ে পথে চললাম। ফিরে আসার পথে আর কোথাও চা খেলাম না। শীত আমাকে তার নির্যাতন হতে মুক্ত করে দিয়েছিল, সূর্যকিরণের প্রখরতা আমার চোখে লাগছিল না, আমি চলছিলাম একদম শীতগ্রীষ্মবোধহীন হয়ে শহরের দিকে, মাথা নত করে পলাতক বানরের মত, কোথাও আশ্রয় পাবার জন্য। আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কাকে কি বলব? আমার দেশ নেই, আমার জাত নেই, আমার মাঝে মনুষ্যত্ব নেই, শুধু এক প্রবল বাসনা শুধু বেঁচে থাকবার জন্য। পথে চলার সময় বেঁচে থাকার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। পথকেই বলছিলাম সকাতরে, পথ আমাকে আশ্রয় দাও, তোমার বুকের ওপর সবাই হাঁটে তাই আমিও হাঁটছি।

তোমার মাঝেই আমার লয় হোক, কারণ তুমি জাতবিচার কর না, বাদামী এবং সাদাতে তুমি পার্থক্য দেখাও না। তুমি সকলের জন্য উন্মুক্ত, সকলের রক্তের বিনিময়েই তোমার জন্ম। তোমার বুকের ওপর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী মদগর্বে যেমন হাঁটছে, দরিদ্র পরাধীন জাতের লোকও তেমনি পদনিক্ষেপ করছে। তুমি পুঁজিবাদীরও নও, শাসনকারী জাতেরও নও। তুমি দাম্ভিক ভাড়াটে গুণ্ডারও নও, দীন মজুরেরও নও। তুমি সকলের। তোমার ওপর বরফ পড়ে তোমার বুক সাদা হয়েছে, আবার দাম্ভিক নরপিশাচদের রক্তপাতে তুমি রংগিনও হচ্ছ। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি ভরসা পরাধীনের, তুমি ভরসা নামগোত্রহীনের, তুমি আমার। তোমার ওপর চলতে চলতেই যেন আমার পরাধীন জীবনের সমাপ্তি হয়।

তিন

রাজার রাজ্য কি করে চলে প্রজা সে সংবাদ একদিন রাখত না। আজও বাংলাদেশের বৃটিশ রাজ্য কি করে চলে তার সংবাদ বাংগালী সর্বসাধারণ কজন রাখে? বৃটিশ সরকার, জমিদার, তালুকদার, মিরাশদার, খুদে জোতদার—জোতদারের পর হল ভূমি-পুত্র চাষার স্থান। চাষা জানে শুধু জোতদারকেই। বাংলা দেশের শিক্ষা এবং গণজাগরণের সংগে আফগানিস্থানের গণজাগরণের তুলনা হতে পারে না। গণজাগরণের হিসেবে বাংলাদেশ আফগানিস্থানের বহু উচ্চে স্থান দখল করে নিয়েছে। আফগানিস্থান স্বাধীন আর ভারতবর্ষ পরাধীন। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের একটা অংশ মাত্র। বাংগালী শিক্ষিত হয়েও বাংলাদেশের সংবাদ রাখে না। কিন্তু শিক্ষার হিসাবে কাবুলীরা আমাদের অনেক পেছনে থাকা সত্ত্বেও, এদের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য

থাকায়, ভারতীয় কৃষকের মত পাঠান কৃষক জোতদারের হাতে কাবু হয়ে পড়েনি। পাঠান বোঝে, খাজানা দিতেই হবে অতএব ন্যায্য খাজানা তুমি রাজা স্বয়ং এসে নাও কিংবা একটা বাঁদরের গলায় থলি বেঁধেই পাঠিয়ে দাও, খাজানা পেয়ে যাবে। কিন্তু পাঠান চাষা অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। নায়েববাবু, পেয়াদা বাবু, কেরানিবাবু, পুলিশবাবু এসবের তারা ধার ধারে না। অন্যায় করেছ কি মরেছ—অটোমেটিক মেশিনগান চালিয়ে প্রতিকার করবে ঐ খুদে চাষা। সে জীবনের ভয় করে না।' সে আর্ম অ্যাক্ট মানে না। আর্ম অ্যাক্ট আফগানিস্থানে চলে না। যেখানে আর্ম অ্যাক্ট নেই, সেখানে আর্মএর অপব্যবহারও হয় না।

যেখানে লোকের চলতি পথে স্বাধীনতা আছে, তথায় লোক রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্র এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না। পাঠানরা স্বাধীন, তাদের মাথা ঘামাতে হয় না যে দুরানী বংশ রাজা হল, কি খিলজাই বংশের লোক রাজা হল। তারা কখনও ভাবে না সরকারী চাকুরি কে পেল আর কে না পেল। তাদের আত্মরক্ষা করার জন্য তলোয়ার বন্দুক পিস্তল অটোমেটিক মেশিনগান রয়েছে, সেজন্যই সে কাউকে ভয় করে না। আপন পরিবার, গ্রাম, এমন কি ছোট ছোট সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের দেখাশুনা করে থাকে। রাজার পেয়াদা অথবা চাকর গ্রামের মালিকের কাছে হাজির হয়ে রাজকীয় আদেশ জানিয়ে আসে। গ্রামের মালিক সবাইকে ডেকে রাজার আদেশ শুনিয়ে দেয়। সর্বসাধারণ যদি সে আদেশ ভাল বোঝে তবে মেনে নেয় নতুবা আদেশ অগ্রাহ্য করে। রাজার আদেশ সকল সময় চলে না, কারণ গ্রামের লোক স্ত্রীপুত্রপরিবার সমেত কবরস্থ হতে রাজি তবুও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। সেজন্যই

আফগান জাত নানাদিকে বাংগালীর পেছনে থেকেও বাংগালীর চেয়ে একদিকে উন্নত জীবন কাটাচ্ছে। এখানে কথা ওঠে, যদি কোন গ্রামে পাঁচ ঘর হিন্দু, দশ ঘর শিয়া এবং পঁচিশ ঘর স্থন্নি থাকে, তবে দুটি মাইনরিটি শ্রেণীর লোক মেজরিটির কথা শুনবে কেন? এখানে একটা মজার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আফগানিস্থানের শাসন-নীতি ভেদনীতির পক্ষপাতী নয়। আফগান জাতও ভেদনীতির সমর্থক নয়। আমার জমি আমি চাষ করছি। আমার বাড়িতে আমি বাস করছি। ঋণের দায়ে আমার কিছুই যাচ্ছে না, আমি ভেদাভেদ কার সংগে চালাব? জমির জন্য আমাদের ঝগড়া হয় তার একমাত্র কারণ হল বুদ্ধিজীবিরা নানারূপ বদমতলব কার্যে পরিণত করার জন্য আইনের আশ্রয় নেবার পথ বাতলিয়ে দেয়। যারা আইনের আশ্রয় নেয় তারা দরিদ্র এবং কাপুরুষ। আফগানরা আইনের মীমাংসা আইনজীবী হাতে না ছেড়ে দিয়ে নিজেদের হাতেই রেখেছে। বদখেয়াল যেখানে নেই সেখানে মেজরিটি মাইনরিটির কথা মোটেই ওঠে না। বন্দুক কামান, ছোরা তলোয়ার এ সবই হল তাদের আত্মসম্মান বজায় রাখার একের নম্বর অস্ত্র। সেজন্য আফগানরা মানুষের অধিকার নিয়েই সসম্মানে সুখে আছে বললে কোন দোষ হয় না। শাসকদেরও ভেদনীতির আশ্রয় নেবার প্রয়োজন হয় না।

রাষ্ট্র স্ত্রী-জাতির কোন স্বাধীন সত্তা স্বীকার না করলেও আফগানরা মায়ের জাতের যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে কখনই শৈথিল্য দেখায় না। স্ত্রীলোকের অসম্মানকারীর প্রতি তারা কড়া শাসনের ব্যবস্থা নিজেদের হাতেই রেখেছে, রাজকর্মচারীর ওপর ছেড়ে দেয়নি। ঘরে সাপ ঢুকলে যেমন গ্রামের লোক জ্ঞাতি-শত্রুতা ভুলে গিয়ে সাপকে হত্যা করে, তেমনি ভাবে পাঠানরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারীকে হত্যা

করতে পর্যন্ত দ্বিধা করে না। হত্যা তিন রকমে হয়ে থাকে। গুলি করে মারা, পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, এবং শরীরটার নীচের ভাগ মাটিতে পুঁতে ফেলে বাকি অর্ধেকটাতে ক্রমাগত ঢিল ছোঁড়া।

আমেরিকায়ও স্ত্রী জাতির প্রতি অত্যাচারীর শাস্তি বিধানের ভার সর্বসাধারণ এখনও নিজের হাতেই রেখেছে, ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট অথবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেয় নি। আমেরিকার লোক শুধু নিগ্রোদেরই লিঞ্চ করে না, সাদা লোকদেরও লিঞ্চ করে। তবে সাদাদের লিঞ্চের সংবাদ কোনও সংবাদপত্রে ছাপান হয় না. এজন্যই বিদেশের লোক সে সংবাদ মোটেই পায় না।

পাঠানরা স্বদেশের স্ত্রীলোকেরই মানইজ্জত বজায় রেখে ক্ষান্ত নয়, কোনও বিদেশী স্ত্রীলোকেরও আফগানিস্থানে অত্যাচারিত হবার আশংকা নেই। নারীর সম্মান রক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুপ্রতিনিধি একটা ঘটনা বলেছিলেন।

আমেদাবাদ শহরে কোনও এক হিন্দু রমণী স্বেচ্ছায় একটি পাঠানকে বিয়ে করে কাবুল আসে। কাবুলের আবহাওয়া তার মোটেই পছন্দ হয়নি। বোরখা পরতেও তার ভাল লাগেনি। সেজন্যই বোধ হয় স্ত্রীলোকটি পাঠানকে বার বার আমেদাবাদে ফিরে যেতে অনুরোধ করে। পাঠান তাতে সম্মত হয়নি। স্ত্রীলোকটি দেশে ফিরে আসার জন্য নানারূপ চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হয়নি তখন একদিন পথে এসে সে চিৎকার করে লোকসমাজের কাছে তার দুঃখের কথা বলে। পথের লোক তৎক্ষণাৎ প্রতিকার করতে গিয়ে দেখে পাঠান গৃহ ছেড়ে পালিয়েছে। জনতার তখন কিছুই করার ছিল না। তারা তখন স্ত্রীলোকটিকে পুলিশের হাতে অর্পণ করে। পুলিশ রমণীটিকে হিন্দু-

প্রতিনিধির বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তিন মাস পর বৃটিশ সরকার হিন্দু রমণীটির দেশে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করেন।

অন্তত মনের দুটি অবস্থায় আমোদ-প্রমোদ বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে। প্রথমত, শরীর যখন সুস্থ থাকে, মনে যখন কোনরূপ উদ্বেগ থাকে না, তখন নিরুদ্বেগ প্রফুল্লতাকে আমোদ আহ্লাদের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত করতে মন স্বতই উৎসুক হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, মন যখন অপমানে এবং ক্ষোভে একদম দমে যায়, তখন ভগ্নহৃদয়কে আমোদ-আহ্লাদের একটা সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে আচ্ছন্ন করে রাখলে মনে বেশ শান্তি আসে। নানা কারণে আমার মন দমে গিয়েছিল। অপমানের বোঝা আর সইতে পারছিলাম না। সে জন্যই আমোদ-প্রমোদের সন্ধানে বের হয়েছিলাম। আফগানিস্থানে সিনেমা নেই যাতে করে মনে একটু শান্তি আনতে পারা যায়, অপেরা নেই যেখানে গিয়ে মনের বিষাদ লাঘব করতে পারা যায়। শীতের সময় নৃত্য অথবা হৈহল্লাও নেই যে তা দেখে সময় কাটাই, অথচ আমার কাবুল শহরে আর থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। মোটরে গজনি হয়ে কান্দাহার যাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু পথে প্রচুর বরফ থাকায় গাড়ি চালান মোটেই সম্ভব ছিল না। তখন বাধ্য হয়েই পুরা একটা মাস আমাকে কাবুল শহরে থাকতে হল।

কাবুলে পুরা এক মাস থাকতে বাধ্য হলেও অলস ভাবে আমি দিনগুলি কাটিয়ে যাই নি। ঠাণ্ডার মাঝেই সর্বত্র বেড়িয়েছি। কাবুলে একজন পার্শি ব্যবসায়ীর সংগে আমার পরিচয় হয়। তিনি পর্যটকদের বড়ই ভালবাসেন। আমাকে একাকী সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বহির্গত হতে দেখে তিনি খুব বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে সক্ষম হওয়ায় তিনি

সন্তুষ্ট হলেন বটে কিন্তু আমি যে-মতবাদ পোষণ করি তাতে তিনি দুঃখিত হলেন। দুঃখ হবার কথাই। এত সাধের স্বর্গরাজ্য—যেখানে যাবার পর যা চাওয়া যায় সবই পাওয়া যায়—সেখানে আমি যেতে চাই না, এমন কি তার অস্তিত্বও বিশ্বাস করি না। কথায় কথায় তিনি প্রশ্ন করলেন, এ শহরে নানারূপ জিনিস দেখার আছে, তা আমি দেখেছি কিনা? জিজ্ঞাসা করে জানলাম এখানে অনেক পুরাতন বই আছে। হালে বোখারা হতে যারা পালিয়ে এসেছে তারা সে সকল বই সংগে করে এনেছে।

আমি সেই বইগুলির অনুসন্ধানে বের হলাম। কোথায় এবং কার কাছে বইগুলি আছে তা আমার জানা ছিল না। পার্শি ব্যবসায়ীও তা বলে দেননি। ফিরে এলাম সেই চায়ের দোকানে যেখান হতে আমি বার বার আঁধারের মাঝেও আলো পাচ্ছিলাম। এবার সেই বয় আমার সংগে কথা বলল—যে চা-র দাম দেবার সময় বলেছিল 'পরে দিলেও হবে', অথচ কতক্ষণ পরই ভান করেছিল সে বাংলা জানে না, সে বাংগালী নয়। এই যুবকের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয় পেশোয়ারে একটি দই-এর দোকানে। তখন তার পরনে ছিল পাজামা এবং পাঠানের পাগড়ি। এবার সে দয়াপরবশ হয়েই কথা বলল। বইএর সন্ধান কার কাছে গেলে পাব তাও সে বলে দিল। সে সত্বরই রুশ দেশে যাবে তাও জানালে। রুশ দেশে যাবে সে একা নয়, আরও অনেক লোক।

বই দেখার দিকে আমার মন এতই ঝুঁকেছিল যে আমি তৎক্ষণাৎ বয়-কথিত মিঃ আবদুল্লার আফিসের দিকে রওনা হলাম। আবদুল্লার সংগে পূর্বেও আমার কথা হয়েছিল। তিনি একজন পাঞ্জাবী মুসলমান। তাঁর অনেক বদনাম রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কাছ থেকে শুনেছিলাম, এমন কি তিনি তাঁর ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন নামক মাসিক

পত্রে আবতুল্লাকে লক্ষ্য করে অনেক কথাই লিখেছিলেন। আমি সেই আবতুল্লার বাড়িতে গিয়েই বইএর সন্ধানে তাঁকে নানা প্রশ্ন করলাম। আবতুল্লা শিল্প-বিভাগে মন্ত্রিত্ব করেন। তাঁর অধীনে অনেক মজুর অনেকগুলি কম্বল এবং দেশলাইএর কারখানাতে কাজ করছিল। তাঁর কারখানা এবং মজুর দেখে সন্তুষ্ট হলাম কিন্তু বইএর কোন সন্ধান পেলাম না। অবশেষে তাঁরই কারখানার একটি হিন্দু মজুর আমাকে বইএর সন্ধান দেয়।

বই—যা আমি দেখতে চাই না তাই শেষটায় আমাকে টানছে। বই দেখে আমার কি লাভ হবে? বই লেখা হয়েছে, লেখা হচ্ছে এবং হবেও, তবে কেন বইএর দিকে টান? দেখাই যাক সে কি রকম বই। কোন ধর্ম বই আমাকে টানতে পারবে না তা যে ধর্মেরই হোক না কেন। এই কথাটা মনে রেখেই একজন বৃদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ীর দোকানে প্রবেশ করলাম। দোকানী বেশ ভদ্র। দোকানে প্রবেশ করা মাত্রই লোকটি আমার সংগে কথা বলতে শুরু করল। দোকানীর কথা বলার ধরনটি বেশ সুন্দর ছিল।

—আপনি ধর্ম বই দেখতে চান না, তবে কি বই দেখাব বলুন? ইতিহাস আমার কাছে মোটেই নেই। আচ্ছা, একটা বড় বই আছে যাতে ভাষা সম্বন্ধে নানা তথ্য লেখা রয়েছে। আপনারা গুণী লোক সে বইটাই দেখুন।

আমি তাতে রাজি হলাম এবং যেখানে বই দেখান হয় সেখানে গিয়ে বসলাম।

ঘরটি ছোট। তুটি মাত্র খিরকি দরজা। তা দিয়ে যে আলো আসে তা প্রচুর নয় বলে বারোটা মোটা মমবাতি প্রজ্জলিত করা হয়। লোকটি বইখানা আমার সামনে রেখে দিয়ে বললে, বইখানা গ্রীক

ভাষায় লিখিত বলেই মনে হয়। কিন্তু অনেক গ্রীক বলেছে এটা গ্রীক ভাষায় হয়তো হতে পারে, কিন্তু যে অক্ষর ব্যবহার হয়েছে তা গ্রীক বর্ণমালার অনুরূপ হলেও পাঠোদ্ধার করা যায় না।

আমি বইখানার কাগজ পরীক্ষা করতে লাগলাম দেখে দোকানী হেসে বললে, এতে কোন লাভ নেই। আপনি অক্ষর দেখুন তাতে লাভ হবে।

পৃথিবীতে নানা রকমের অক্ষর আছে। তার মাঝে কোনটা পুরাতন কোনটা অপেক্ষাকৃত নতুন কে জানে। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের ধারণা সংস্কৃত অক্ষরই পুরাতন। কিন্তু যে দিন থেকে বুঝলাম সংস্কৃত মানে যাকে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছে, সে দিন থেকেই ভুলে গেলাম সংস্কৃতের প্রাচীনত্ব। ভাবতে শিখেছিলাম, সেই অক্ষরগুলিকে আমার জানা চাই যেগুলিকে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছে এবং "সংস্কৃত" নাম দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয়, যা আমি দেখছি তাই আদিম। বিদেশের স্লাভ গ্রীক, এবং দেশের মৈথিলী এ সব অক্ষর আমি চিনতাম। মনে হল, একদিন যা দেবনাগরী ছিল, এবং যা থেকে বর্তমান বাংলা অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতরা বলেন, সেই দেবনাগরী অক্ষরের সংগে এই পুরাতন বইটার অক্ষরের বেশ মিল রয়েছে।

আমার ইচ্ছা হল বইখানা কিনে ফেলি। কিন্তু বইখানার দাম শুনে মনে হল, আমি কেন অনেক ধনীও দাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন। বইখানা দেখাই হল কিন্তু তার কিছুই হৃদয়ংগম হল না এই যা দুঃখ। আমি অনেকক্ষণ বইখানা দেখে শেষটায় ফিরে এলাম।

পুরাতন বই ছিল, পুরাতন ভাষা ছিল। কিন্তু নতুন এসে এক এক ধাক্কা মেরেছে আর পুরাতনকে ভেংগে ফেলে দিয়ে নিজের স্থান করে

নিয়েছে। আফগানিস্থান যদিও পুরাতন এবং নতুনের দ্বন্দ্বক্ষেত্র তবুও আফগানিস্থান অদৃশ্য হাতের খেলার বস্তু হয়ে আজও পুরাতনকেই আঁকড়ে ধরে আছে।

স্থানীয় আর্যসমাজীরা নতুন নিয়মে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য চেষ্টা করছিল। সনাতনীরা তাতে বাধা দিতে গিয়ে বলছিল, তা কি হতে পারে? এতে হয়তো পক্ষপাতপূর্ণ রাজনীতি এসে যেতে পারে। এখানে পক্ষপাত শব্দটির ব্যবহার দেখে আমার মনে হল, সনাতনীরা শব্দেরই ব্যবহার করতে জানে, কিন্তু পক্ষপাত কাকে বলে তাও হয়তো ভাল করে জানে না। আর্যসমাজী এবং শিখরা সনাতনীদের কথায় কান না দিয়ে সভার বন্দোবস্ত করল।

মহাভারতের ব্যাসদেব দেশবিদেশ ভ্রমণ করার পর যখন কোন রাজবাড়িতে যেতেন, তখন তাঁকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করা হত, আমাকেও ঠিক সেরূপভাবেই অভ্যর্থনা করার বন্দোবস্ত হল। যথা-সময়ে সভায় উপস্থিত হয়ে সর্বসাধারণের সম্মান প্রাপ্ত হলাম। আমাকে একখানা বেদীতে বসান হল। তথায় বসে ঠিক পূর্বকালের কথকদের প্রথামতে আমার ভ্রমণকথা বলতে লাগলাম। সভায় সভাপতি কেউ ছিলেন না। শুধু একজন লোক আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লেন।

যারা গংগার ধারে বসে কথকতা শুনেছেন, তাঁরা দেখে থাকবেন কথকরা কেমন করে শ্রোতার মন আকর্ষণ করে থাকে। ইচ্ছা করেই আমি সে ভাবেই কথকতা শুরু করেছিলাম। আমার ভ্রমণকাহিনী একদিনে সমাপ্ত হয়নি। প্রথম দিন কথকতা করে তিনশত কাবুলি মুদ্রা দক্ষিণা পেয়েছিলাম। আমার ভ্রমণকাহিনী অনেকের ভাল লেগেছিল বলেই বোধ হয় পর দিনও আবার সভার আয়োজন হল।

দ্বিতীয় দিনও অনেক লোক হয়েছিল। প্রথম দিন যারা আমার কথকতা শুনেছিলেন পরের দিনও তারা সদল বলে উপস্থিত হন এবং দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়ে ধন্য হন। লক্ষ্য করেছিলাম, টাকা দেবার বেলা দাতা নিজের সমুদায় শরীরটা বুলিয়ে দিয়ে টাকাগুলি থালাতে ঢেলে দিচ্ছিল। গোপনে একটি যুবককে এরূপ করে টাকা দেবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করেছিলাম? সে বলেছিল দেশভ্রমণকারীকে নিজের শরীর বুলিয়ে টাকা দিলে দাতার শরীরে কোন রোগ অসে না এবং দেশভ্রমণকারী এই টাকার সাহায্যে যত দূরে যায় ততই বিপদ-আপদও দূরে চলে যায়। এদের ধারণা বিপদ-আপদও এক ধরণের শরীরধারী জীব। এদের কুসংস্কার ও অমার্জিত বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করলাম।

এরা তাদের সংস্কারকে দৃঢ় করার মত একটি হেতুও পেয়ে গেল। আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলার দ্বিতীয় দিন আসর ভাংগার পর আসামাই মন্দিরের পূজারীর দ্বিতীয় পুত্র তার দোকানে হতে সেদিনের বিক্রয়-লব্ধ টাকা নিয়ে আসার সময় পথে দেখতে পায় একটি পাঠান বরফে জমে আছে। লোকটি জ্বালানী কাঠ বিক্রয়ার্থ এসে তারই দোকানের কাছে দাঁড়িয়েছিল এবং সেখানেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরদিন সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পূজারী রটিয়ে দিল, ভাগ্যে তার ছেলে দেশভ্রমণকারীকে শরীর বুলিয়ে দশ কাবুলি দিয়েছিল নতুবা পাঠানের ওপর যে ভূত চেপেছিল সেই ভূত তার ছেলের ওপরও চড়াও হয়ে নিশ্চয়ই তাকেও শীতে জমিয়ে মেরে ফেলত। এতে আমার বেশ লাভই হল। যারা আমাকে ইতিপূর্বে দান করে বিপদ হতে মুক্ত হবার সুযোগ পায়নি তারা আমাকে বাড়ি বয়ে এসে দান করে যেতে লাগল। প্রাপ্তির অংকটা আমার বেশ মোটা রকমেই হতে লাগল।

সনাতনীরা আমার পা ছুঁয়ে দান করতে লাগল যাতে তাদের কোন লোক শীতে জমে না মরে।

শীতে জমে লোক মরে সে কথা সবাই জানে। আমাকে দশ টাকা দান করার দরুন পূজারীর ছেলে মরে নি, তার বদলে মরেছে একটি পাঠান যে দান করেনি। এর মানে হল পর্যটককে দান করার দরুণই শীতরূপী ভূত তার ঘাড়ে না চেপে হতভাগ্য পথচারী পাঠানের ঘাড় মটকিয়েছে। অথচ শীতে কদিন পূর্বে আমার নিজেরই কিরূপ বিপদ হয়েছিল সে কথা অনেকেই আমার মুখে শুনেছিল। ওঝার শর্ষের ভেতরও ভূত লুকিয়ে থাকে!

এরূপ যে হুজুগে হিন্দু-সমাজ, সেই সমাজ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলব না। তবে আমি চিন্তা করছিলাম কাবুলের হিন্দুরা নবাগত না পুরাতন। সেজন্য আমি হিন্দুদের কাছে গিয়ে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলাম। আফগান সরকার যখনই দেশবাসীর প্রতি কোন আদেশ দেন তা সর্বসাধারণকে না বলে সমাজপতিদের নামেই জারি করা হয়। এতে দেখা যায় হিন্দু পরিবারগুলিও সমাজপতিদের আওতার মাঝেই এসে পড়ে। এখানে ধর্মের কোন কথা ওঠেই না। তুমি যে গোষ্টির লোক সেই গোষ্টির সংগে তোমাকে কাজ করে যেতেই হবে। তবে পাঞ্জাব হতে নবাগত হিন্দুদের কথা পৃথক। বর্তমানে নবাগত ভারতবাসী আর আফগানিস্থানের নাগরিক হতে পারে না। তাদের প্রত্যেককে কুড়িদিন অন্তর পুলিশ স্টেশনে গিয়ে কাজকর্মের হিসাব দিয়ে আসতে হয়। আফগানিস্থানে নবাগত ভারতবাসী আর নাগরিক অধিকার না পেলেও পাঠানরা কিন্তু ভারতবর্ষে সে অধিকার হতে বঞ্চিত হয়নি। এটা মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। পাঠানরা এখনই বুঝে নিয়েছে এসব অসম আইন-কানুনের মানে কি?

তারা কুকুর প্রকৃতির লোক নয় যে হাড় চুষবে আর মনিবের পদলেহন করবে।

নানারূপ সংবাদ জানবার চেষ্টায় যখন ব্যস্ত ছিলাম তখন একদিন হিন্দুপ্রতিনিধি আমাকে তাঁর বাড়িতে চা পানের নিমন্ত্রণ করেন। আমি তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সাদরেই গ্রহণ করেছিলাম। আমি জানতাম হিন্দুপ্রতিনিধি নিশ্চয়ই আমার কোন সাহায্যই চাইবেন, অনিষ্ট করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম স্থানীয় চিফ জাষ্টিস্‌ও তথায় নিমন্ত্রিত। আইনের সর্বময় কর্তাটি ধর্মে হিন্দু, জাতে পাঠান। তাঁকে সনাতনী বলেই মনে হয়েছিল কারণ তিনিও বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী নন।

কাবুল শহরে থাকার সময় ধর্ম সম্পর্কে কএকদিন আলোচনা করেই বুঝেছিলাম এটাও দ্বিতীয় নেপাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের পক্ষে কথা বলতে পার যত ইচ্ছা, কিন্তু ধর্মের বিপক্ষে বলবার, এমন কি ধর্মে যদি কোন গলদ থাকে তবে তাও নির্দেশ করবার অধিকার নেই। সরকারী আইন তা মঞ্জুর করে না। সেজন্য আমাকে শুধু শুনে যেতেই হত। যখনই কিছু নিয়ে প্রতিবাদ করতে হত তখনই শাস্ত্র হতে শ্লোক উদ্ধৃত করে কথা বলতে হত। শাস্ত্রে আমার কিছুমাত্রও পাণ্ডিত্য নেই, কাজেই আমার চুপ করে থাকা ছাড়া উপায়ও ছিল না।

আইনের মালিক চিফ জাস্টিস্‌ এবং হিন্দুপ্রতিনিধি উভয়েই বৃদ্ধ, এবং উভয়েই যুবতী ভার্যার পাণিগ্রহণ করেছেন। চিফ জাস্টিস মহাশয় বাচ্চা-ই-সাকোর রাজত্ব কালে দেশ হতে পালিয়ে যান এবং ইরান দেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইরানীরা তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করত যদি তিনি প্রথমেই হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি তাঁর পরিচয় নিজের গোষ্টির সংগে

জড়িয়ে ফেলেন। তাঁর গোষ্টির লোক এককালে ইরানিদের শত্রু ছিল। তারপর যখন দেখলেন ইরানীরা ভাল ব্যবহার করছে না, তখন তিনি নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেন। তাতে কোন ফল হয়নি। তাঁকে যতটুকু সাহায্য করা হয়েছিল তা ইনটার-ন্যাশনেল আইন বজায় রাখার জন্যই। ইরানে তাঁর শরীর ভেংগে যায়। হিন্দুপ্রতিনিধি আমাকে একটি প্রশ্ন করেন যে কি করে কএক বৎসরের জন্যও যৌবন ফিরিয়ে পাওয়া যায়। আমি সে প্রশ্নের উত্তর কি দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এদিকে ওদের কিছু বলাও দরকার। অগত্যা শরীর ভাল রাখার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবহার করতে তাদের পরামর্শ দিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা চান, কোন মন্ত্রশক্তির সাহায্যে আমি তাদের যৌবন কএক মিনিটের মাঝেই ফিরিয়ে আনি। তাঁদের পুরাপুরি ধারণা, বাংলা দেশের লোক সবাই যাদুকর এবং তারা মন্ত্রশক্তির প্রভাবে মানুষকে ছাগল এবং ছাগলকে মানুষে পরিণত করতে পারে। বস্ত্রব্যবসায়ী লগনী-ব্যবসায়ী পাঠানরা নাকি এসব আশ্চর্য ঘটনা বাংলা মুলুকে স্বচক্ষে দেখে গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় উভয় ভদ্রলোকই শিক্ষিত, নানা দেশের রাষ্ট্রনীতির সংগে পরিচিত, অথচ তাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করেন। আমি তাঁদের বললাম, যে সকল কথা আপনারা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন তা সত্য নয়, মন গড়া কথা মাত্র। উভয় ভদ্রলোকই আমার কথায় দুঃখিত হলেন এবং আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিতে পারেন নি।

সেদিনই বিকাল বেলা মিঃ আবদুল্লার সংগে ফের দেখা করলাম এবং বাচ্চা-ই-সাকোর সম্বন্ধে কএকটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, বাচ্চা-ই-সাকো যখন পালিয়ে যান তখন তাঁরই

চেষ্টায় বাচ্চা-ই-সাকো ধরা পড়েন এবং তাঁরই উদ্যোগেই বাচ্চা-ই-সাক্কোর ফাঁসিও হয়েছিল।

কাবুল শহর রাষ্ট্রনীতি আলোচনার একটি বিশেষ আড্ডা। কাবুলের একদিকে রুশদেশ। অন্যদিকে ইরান হতে তুর্কি পর্য্যন্ত মুসলিম ধর্ম অধ্যুসিত দেশগুলির কর্মপদ্ধতি অথবা চালচলন লক্ষ্য করার মত। এখানে বসেই হিন্দুদের কাঁপিয়ে তোলার মত বাক্য উচ্চারণ করার সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া যায়। এখানে বসেই অনেক রাষ্ট্রনৈতিক ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে নানা রকম প্রবন্ধ রচনা করেন। পূর্বে এখানে বসেই অনেক বৈদেশিক খাসগার তথা চীনা-তুর্কিস্থানের উপর চালবাজি করতেন। কিন্তু রুশীয়রা সেই চালবাজিতে বাধা দিয়ে তুংগান সরদার মহাম্মদকে খাসগার হতে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন তিনি শ্রীনগরে বাস করছেন। এই কাবুলে বসেই একদিন আনোয়ার পাশার বোখারা আক্রমণের প্ল্যান রচিত হয়েছিল। কাবুলও পৃথিবীর একটি চালবাজির কেন্দ্রস্থল। কাবুলের রুশ রাষ্ট্রদূত যখন তাঁর বাড়ি হতে বের হন তখন লোক অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকায়। আবার যখন একজন খর্বকায় জাপানী লাঠি হাতে করে গম্ভীর মুখে পথে পথে বেড়ান তখন হুঁশিয়ার লোক তানাকা মেমোরিয়েলের কথা স্মরণ করে কেঁপে ওঠে। ব্রিটিশ রাজদূত উদাসীর মত পৃথিবীর সকলকে উপেক্ষা করে নাক উঁচু করে যখন পথে বের হন তখন অনেকেই তাঁকে চীন-সম্রাটের সংগে তুলনা করে। কে বলে কাবুলে প্রাণ নেই?

ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমোদ হয়। নীরব নিস্তব্ধতার মাঝেও ডিপ্লমেটিক চালবাজি দেখে আনন্দ পাওয়া যায়। ডিপ্লমেটিক চালবাজি দু রকমের। আভ্যন্তরিক এবং বাহ্যিক। বাহ্যিক চালবাজিই সাধারণ লোক দেখতে পায়, আভ্যন্তরিক চালবাজি বুঝবার জন্য সাধারণ লোক

চেষ্টাও করে না। আমি বাইরের দিকের চালবাজি দেখেই আনন্দিত হতাম।

জীবনের আকাংখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মাঝে কাবুল শহরও একটি ছিল। তা আমার দেখা হয়ে গেল। আমি একদিন ভাবলাম কাবুলের কনসালগুলির বাড়ি বেরিয়ে আসা উচিত। কারণ এই বাড়িগুলিও দ্রষ্টব্য বস্তু সমূহের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে। কএকজন কনসালই আমার প্রতি আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন এবং আমার ভ্রমণ যাতে সফল হয় তার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। একজন কনসাল শুধু উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, রুশ দেশে যাওয়া আমার সমূহ দরকার। আবার সংগে সংগেই বলেছিলেন রুশ দেশে গেলে অন্য কোনও দেশের ভিসা পাওয়া মুশকিল হবে, অতএব ভাবা উচিত একদিকে সমগ্র পৃথিবী আর একদিকে কেবলমাত্র রুশিয়া—এ দুএর কোন্‌টা কাম্য। আমি জানতাম পারেয়ারী বলে এক ফরাসী ভূপর্যটক বাইসাইকেলে রুশ দেশের এক সীমান্ত হতে অন্য সীমান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর সংগে আমার দেখা হয়েছিল সাইগনে। তিনিই আমাকে বলেছিলেন রুশরা যেভাবে পর্যটকদের সাহায্য করে, পৃথিবীর আর কোন জাতই তেমন করে না। সাইগনে সর্বসাধারণের কাছে যখন তিনি তাঁর ভ্রমণ-কথা বলতেন তখন রুশ দেশের কমিউনিজমকে বেশ প্রশংসা করতেন। রুশ দেশের কমিউনিজমের প্রশংসা করাও তখনকার দিনে পাপ বলে গণ্য হত, সেজন্য তাঁর মনের পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যার মাঝে একবার কমিউনিজমের বীজ ঢুকে তার পক্ষে তা বিনষ্ট করা বড় সহজ নয়। ফ্রেঞ্চ পর্যটক পারেয়ারী কোন মতেই মনের পরিবর্তন করতে সক্ষম হননি। সেইজন্যই হয়তো, অন্তত আমি যতদিন সাইগণ ছিলাম, ততদিন তিনি

ফরাসী ইন্দোচীন পরিত্যাগ করতে সক্ষম হননি। এতটুকু জেনে শুনে রুশ দেশে যাওয়াটা আমার কাছে সমীচীন বলে মনে হয়নি। সেজন্যই আমি রুশিয়ায় যাওয়ার কথা উঠলেই বিষয়টাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করতাম। এক্ষেত্রেও তাই করলাম। রুশ দেশের নাম আমার অভিধান হতে মুছে ফেললাম। অন্য বিষয়ের অবতারণা করে কনসাল মশায়ের সংগে আলাপ চালালাম।

তার

আমার যা দেখবার তা দেখা হয়ে গেছে, যা শুনবার তা শুনেছি, এবার আমার প্রবল বাসনা কাবুল ত্যাগ করবার। কাবুল হতে গজনি পর্যন্ত ভূমি পর্বতময় তো বটেই, উপরন্তু বরফ পড়ে পথ অনেক স্থলেই বন্ধ হয়ে আছে। ডাক চলাচলের সুবিধা মাত্র হয়েছে তাই প্রধান মন্ত্রীকে বলে ডাকের মোটরেই কান্দাহার যাবার বন্দোবস্ত করলাম। অতি অল্প পরিশ্রমেই আমার কাবুল পরিত্যাগের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একদিন সুপ্রভাতে বহুদিনের প্রত্যাশিত কাবুল শহরকে নমস্কার করে আবার নতুন পথে যাত্রা করলাম।

আমি যে মোটরে রওয়ানা হয়েছিলাম তার নাম হলো "মটরে পোস্ত"। শহর হতে বের হয়েই বুঝতে পারলাম তখন কাবুল পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে কত অন্যায় হয়েছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকই বরফে সাদা হয়ে রয়েছে। সোঁ সোঁ করে প্রবল বাতাস বইছে। আমার যা শীতবস্ত্র ছিল তার সবটাই জড়িয়ে রেখেও শীতে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। তবু ফিরে যেতে আর মোটেই ইচ্ছা হল না।

পার্বত্য পথে মোটর অতি কষ্টেই চলছিল। অনেক বার পিছলিয়ে পথের বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং চাকা বরফে দেবে যাচ্ছিল। সুখের বিষয় আমাদের সংগে শাবল ও কোদাল ছিল, প্রত্যেকটা চাকাও চেন দিয়ে জড়ান ছিল। এতেও যখন মোটর পিছলিয়ে পথচ্যুত হচ্ছিল তখন চেন ছাড়া হলে আমাদের কি অবস্থা হত তা বুঝতেই পারা যায়। পথে কএকটি হিন্দু বস্তি পড়ছিল। ড্রাইভারের প্রতি সরকারী আদেশ ছিল যে, পথের মাঝে যে-কোন হিন্দু বস্তি পড়বে সে যেন তা আমাকে দেখায়।

প্রথম দিনই বিকাল বেলা আমরা একটা হিন্দু বস্তিতে এলাম। এই বস্তির লোকজনদের দেখে আমার মনে হল না এরা হিন্দু, এমন কি পাঠান। এদের শরীরের গঠন ঠিক স্কচদের মতই। লম্বা লালমুখো লোকগুলো যেন পৃথিবীর কোন ধারই ধারে না। গুডমর্নিং, নমস্কার, সেলাম আলেকম ইত্যাদি কোন শব্দই তাদের মুখে শুনলাম না। এরা যে ভাষা বলে তার একটা শব্দও আমার বোধগম্য হল না।

গ্রামের কএকটি লোক বরফ পরিষ্কার করছিল, আর কএকজন একটা উটের মাংস ভাগাভাগি করছিল। ড্রাইভার ওদের সংগে ইরানি ভাষায় কথা বলছিল। ড্রাইভার আমাকে বুঝিয়ে দিলে, যদিও এরা হিন্দু বলেই পরিচয় দেয় তবুও হিন্দুস্থানের হিন্দুদের সংগে এদের কিছুই মিল নেই। এরা সকল জানোয়ারেরই মাংস খায়। এদের জাত কোন মতেই যায় না। এরা সকল সময়ই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকে, এরা কারো আদেশ মানে না। পাঠানদের সংগে এদের কোনরূপ লেনদেন নেই। ইচ্ছা হয় খাজানা দেয়, যদি ভাল না লাগল তো গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। কাবুলের মত স্থানের গরমও এরা সহ্য করতে পারে না। এরা পর্বতবাসী। এরা কারো কাছে আজ পর্যন্ত মাথা নত করেনি।

এদের মাঝে হিন্দুপ্রেম জাগাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। সুতরাং সেদিনই আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই একটা ছোট গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামে একটা সরাই ছিল, সেখানেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হল।

সরাইটাতে আসার পর মনে হল যেন একটা খোঁয়াড়ে এসেছি। চারিদিকে উটের অর্ধভুক্ত বিচালি এবং মলমূত্র বরফের সংগে মিশে একটা নরকে পরিণত হয়েছে। যে সকল লোক সরাইএ আশ্রয় নিয়েছিল তারা সবাই গরীব পাঠান। ওদের মুখে বাদামী রংএর দাগ ফুটে উঠেছে। যে বস্ত্র পরে তারা শীত নিবারণ করছে তা অতি সামান্য। প্রত্যেকটি লোকের চোখেমুখে একটা অসহায় ভাব। আমরা এরূপ লোকপূর্ণ একটি ঘরের একটি স্থান দখল করে চায়ের বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। রাত্রে শুধু চা-রুটি খেয়েই থাকতে হল, কারণ যে দোকান-গুলি আটা চাল ডাল বিক্রি করত তারা বাঘের ভয়ে ততক্ষণে দোকান বন্ধ করে ফেলেছে।

রাত্রে ঘরে প্রদীপ ছিল না। অন্যান্য যারা ঘরটাতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা ঘরের ভেতর হতে খড়কুটা জড় করে একটি ছোট আগুন প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নির সাহায্যে আমরা একে অন্যের মুখ দেখতাম আর গল্পলহরির স্রোতে হাবুডুবু খেতাম। এত আজগুবি গল্প এরা বলছিল যে আমার অনেক সময় মনে হত ঘর হতে বের হয়ে পড়ি। একজন বলছিল বাংগালী জাত পৃথিবীর মাঝে এক নম্বরের জাদুকর। তারা ইচ্ছা করলেই যাকে তাকে ছাগল করে রাখতে পারে। বাংগালীরা ছায়ারূপ ধারণ করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যায়, এজন্যই বাংলা দেশে পথঘাটের কোন দরকার হয় না। আমি বাংগালী একথা তারা জেনেছিল সেজন্যই এসব গল্পের অবতারণা। তারপর উঠল

আমারই কথা। একজন বললে এই মুসাফিরের কোন ভয় নেই। যখনই কোন বিপদ আসে তখনই সে বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংগালী পৃথিবী ভ্রমণ করবে না তো কে ভ্রমণ করবে পৃথিবী? এরূপ নানাবিধ আলোচনার মাঝেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

পরদিন প্রাতে উঠেই চা-রুটি খেয়ে আবার রওয়ানা হলাম। আজ আমরা অন্ততঃপক্ষে ষাট মাইল না গেলে কোন গ্রামই পাব না—একথা ড্রাইভার মহাশয় গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন। যে সব মাল আমাদের ব্যবহার করবার জন্ত নামান হয়েছিল সে সব যথাস্থানে রেখে, খাবারের জন্ত কএকখানা পরটা কাগজে মুড়ে আমরা রওনা হলাম। পথে জলের বড়ই অভাব। পার্বত্য দেশের কল্লোলিনী ছোট ছোট নদী নালা সবই বরফ হয়ে গেছে। শুধু পাতকূপগুলিতেই যা কিছু জল পাওয়ার সুবিধা ছিল। নিকটস্থ একটি পাতকূপ হতে জল সংগ্রহ করবার জন্ত মোটর দাঁড়াল। পাতকূপের চারদিক বরফে ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কূপের ভেতর যে বরফ পড়েছিল তা গলে গিয়েছিল। আমরা কেরসিন টিনে জল ভর্তি করে ফের চলতে লাগলাম। এবার পথ বড়ই উঁচু নীচু। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ চলেছে। ড্রাইভারের হাত ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন প্রত্যেক মিনিটেই ভাবছিলাম এই বুঝি গাড়ি পথভ্রষ্ট হয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে চলল। সুখের বিষয় সেরূপ কিছু ঘটে নি। ক্রমাগত পনের মাইল যাবার পর পথের পাশে একখানা পর্ণকুটির দেখতে পেয়ে মোটর দাঁড়া করালাম।

ঘরখানি বড় নয়, মাটির দেওয়াল, উপরে কাদার ছাদ। দরজায় করাঘাত করা মাত্র ঘরের মালিক দরজা খুলে দিয়ে আমাদের বেশ করে দেখে নিলেন। বোধ হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আমরা সবাই

সরকারি লোক।_ সে জন্যই বোধ হয় তিনি চায়ের বন্দোবস্ত করতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু যখন মোটর ড্রাইভার আমার পরিচয় দিল তখন তিনি ভেতর দিককার একটা কুঠুরির দিকে চেয়ে তাঁর স্ত্রীকে চা এবং খাবার তৈরি করতে আদেশ দিলেন।

প্রচুর চা ডিম এবং শুষ্ক রুটি খেয়ে আমাদের বেশ তৃপ্তি হয়েছিল। আমরাও গৃহের মালিককে প্রচুর পরিমাণে সিগারেট এবং চা উপহার দিয়েছিলাম। কুটিরবাসী পাঠান আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, বাংলা দেশ গরম আর এ দেশ ঠাণ্ডা। শীতের সময় এ দেশে ভ্রমণ করা বড়ই কষ্টকর। ড্রাইভারকে তিনি বার বার এই বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন যে বাংগালী মুসাফিরকে যেন শীত থেকে বাঁচিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছান হয়, গজনী পৌছবার পূর্বেই যেন ফ্রস্টবাইট না হয়। দরিদ্র পর্ণকুটিরবাসীর আন্তরিকতা দেখে তার প্রতি আপনা হতেই মনে একটা প্রীতির ভাব জেগে উঠেছিল।

আমাদের মোটরকার 'মটরে পোস্ত' হু হু করে এগিয়ে চলল। চা-পানে শরীরে উষ্ণতা যেটুকু বেড়েছিল, নিমিষের মাঝে তা লোপ পেল। আমি থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। কএক মাইল পথ যাবার পরেই মোটরের চাকা বরফের মাঝে বার বার দেবে যেতে লাগল। অতি কষ্টে শাবলের সাহায্যে চাকা বরফ হতে মুক্ত করে আবার চলতে লাগলাম। এরূপ ভাবে চলার জন্য ঘণ্টায় পনের মাইলের বেশি আমরা এগুতে পারছিলাম না।

বিকালের দিকে আমরা ছোট একখানি গ্রামে পৌছি। এবার আমরা কোনও সরাই-এ না গিয়ে একজন গৃহস্থের বাড়িতে অতিথি হলাম। গৃহস্থ বড়ই দয়ালু। তিনি আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। উত্তম খাদ্য দিলেন। শোবার জন্য প্রত্যেককে গরম বিছানা দিলেন।

খাওয়া শেষ করে গরম বিছানায় আরাম করে বসবার পর গৃহস্বামী বললেন, এ পথেই একজন ভারতীয় মোটর ড্রাইভার গজনী যাবার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। জল এবং পেট্রোলের অভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়। বরফপাত শুরু হবার কএক দিন পর ঐ মোটর ড্রাইভার কাবুল হতে গজনীর দিকে রওনা হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন পথে জলের অভাব হবে না। কিন্তু পথ ঘাট না জানার জন্য তিনি জলের সন্ধান পাননি। পেট্রোলের উপর নির্ভর করেই তিনি অনেক পথ এগিয়ে যান। শেষটায় পেট্রোলও যখন শেষ হল তখন মোটর আপনি বন্ধ হয়ে গেল। মোটরে নিরাপদ স্থান না থাকায় ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় রাত্রি বেলায় যখন নেকড়ে বাঘের দল তাঁকে আক্রমণ করল তখন আর তিনি প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না। নেকড়ের দল তাঁর রক্ত মাংস সবই খেয়ে গিয়েছিল শুধু রেখে গিয়েছিল ছিন্ন বস্ত্র। ড্রাইভার যে ভারতবাসী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সেই ছিন্ন বস্ত্রের মাঝে রক্ষিত পাশপোর্ট দেখে। অতঃপর গৃহস্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, আফগানিস্থান সুখ এবং দুঃখে পরিপূর্ণ। এখনও এদেশ সভ্যতার আওতায় পুরাপুরি ভাবে আসে নি। রাজা আমান উল্লা সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। দেশ-বিদেশের পুঁজিবাদীদের তা সহ্য হল না। তাদেরই অপচেষ্টার ফলে হতভাগ্য ভারতীয় মোটর ড্রাইভারের অকাল মৃত্যু হল। আমান উল্লা যদি তাঁর নির্ধারিত প্ল্যান মতে রাস্তা তৈরীর কাজ করে যেতে পারতেন তবে প্রত্যেক বারো মাইল অন্তর একটি করে সরাই থাকত। কিন্তু তা হল না। আমান উল্লা চিরতরে দেশ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

কষ্টদায়ক গল্প শোনার পর আর কোন কথাই ভাল লাগল না। সে-দিনকার মত গৃহস্থের বাড়িতে রাত কাটিয়ে পর দিন আমরা গজনীর

দিকে রওনা হলাম। সুলতান মামুদের গজনী দেখবার জন্ত প্রাণ উৎসুক হয়ে ছিল। কিন্তু যা পথ। যখনই ড্রাইভার একটু অন্তমনস্ক হয়েছে অমনি গাড়ির চাকা বরফে দেবে গেছে। আমাদের প্রাণপাত করে চাকা উঠাতে হয়েছে তারপর চলতে হয়েছে।

পাঁচ

চন্দ্র আকাশের উপর উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। নীল আকাশের মাঝে নক্ষত্ররাজি ঝকমক করছিল। চতুর্দিকে পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র আলো দেখে আমার মনে হল এত সৌন্দর্য এ জীবনে আর কখনও দেখিনি। ভাবছিলাম আমার কবি হওয়া উচিত ছিল, সাহিত্যিক হওয়া উচিত ছিল। তা হলে হয়তো আমি এই সৌন্দর্যের কথা ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করে পাঠকের কাছে হাজির করতে পারতাম।

গজনী শহরে একটি হোটেল আছে। হোটেলটি ফরাসী ধরণে পরিচালিত। আমরা সেই হোটেলেই গিয়ে উঠলাম। আমার কাছে কাবুলের প্রধান-মন্ত্রী মহাশয়ের চিঠি থাকায় হোটেলে থাকা বাবত আমকে কিছুই দিতে হয় নি। বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য কএকটা মাত্র টাকা খরচ করতে হয়েছিল। খাবার আনবার জন্য হোটেলের বয়কে বাজারে পাঠালাম। ইত্যবসরে আমি জ্যোৎস্নালোকিত গজনী শহরের পাগল-করা নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু পায়ের গোড়ালিতে এমন একটা ব্যথা বোধ করতে লাগলাম যে সৌন্দর্য উপভোগে গুরুতর ব্যাঘাত জন্মাল। পা থেকে জুতাজোড়া খুলে ফেলতে পর্যন্ত কষ্ট বোধ হচ্ছিল। বয় খাবার নিয়ে ফিরে এলে আমি তাকে পায়ের ব্যথার কথা জানালাম। বয় খাবারগুলি টেবিলের ওপর

ঢাকা দিয়ে রেখে একখানা ছুরি নিয়ে এল। তারপর সে ছুরির সাহায্যে জুতার ফিতাগুলি কেটে ফেলে পা হতে জুতা খুলে ফেলল। আগের দিন ফ্রস্ট বাইট-এর কথা শুনেছিলাম। আজ বয় আমাকে শুনাল আমার পায়ে ফ্রস্ট বাইট হয়েছে। কথাটা শুনামাত্রই পায়ের ব্যথা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চিন্তা হল হয়তো পা দুখানা চির জীবনের মত কেটেই ফেলতে হবে। ভ্রমণ হয়তো এখানেই শেষ। আমাকে চিন্তিত দেখে বয় বললে, চিন্তা করবার কিছু নেই। এখনি ঔষধ আনছি। এই কথা বলেই বয় একটা বেসিনে করে খানিকটা ফুটন্ত জল এনে তাতে নুন মিশিয়ে দিল। জলটা যখন একটু ঠাণ্ডা হল তখন সে আমাকে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে বলল। গরম জলে পা দুখানা ডুবিয়ে রাখার পর ব্যথা অর্ধেকটা কমে গেল। খাবার খেয়ে ফের জলে পা ডুবিয়ে রাখলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হল পায়ে ব্যথা আর নেই। আনন্দে বিছানা হতে নেমেই পোশাক-পরিচ্ছদ পরে সুলতান মামুদের কবর এবং অন্যান্য ইমারত দেখতে বের হয়ে পড়লাম। সুন্দর শাদা বরফের ওপর লাল সূর্যালোক পড়ে চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছিল। আমার চোখে রংগিন চশমা থাকায় সেই ঝলসানো সূর্যালোক কোন অনিষ্ট করতে পারছিল না। আমি আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে একজন লোক সংগে নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেরাতে লাগলাম।

অনেকগুলি পুরাতন ইটের স্তূপ, ভাঙাচুরা পাথর এবং স্থানে স্থানে ইমারতের ভগ্নাবশেষ দেখে মনে হল একদিন যা নিপুণতার সাথে গড়া হয়েছিল তাই আর একদিন সময়ের পরিবর্তনে, চিন্তাধারার পরিবর্তনে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। আজ যা ভাল কাল তা মন্দ। আজ যা শ্রাব্য কাল তা অশ্রাব্য। আজ যিনি পূজিত কাল

তিনি অবহেলিত। এই হল পুরাতন এবং নূতনের সম্বন্ধ। আমি নূতনকে ভালবাসি। পুরাতন ধ্বংস হয়েছে বলে আমার মনে কোন দুঃখ হয়নি। যে শিবলিংগের মন্দিরে একটি মাত্র লোক উপাসনা করত আজ সেস্থানে বিরাট মসজিদের সৃষ্টি হয়েছে। তথায় সহস্র সহস্র লোক সেই ঈপ্সিত পরমারাধ্যেরই নাম উচ্চারণ করছে। একের স্থানে হাজারের স্থান হয়েছে। ছোটর স্থানে বড়র জন্ম হয়েছে। পরিবর্তন আমি এমনি করেই দেখি এবং আজও দেখছি। সংকীর্ণতা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

পাহাড়ের ওপর একটি প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। তারই ওপর পুরাতন একটা স্তম্ভ। স্তম্ভটি স্থলতান মামুদ তাঁর জয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ গড়েছিলেন। স্তম্ভের চারদিকে চিত্রকলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আমার চোখে কিন্তু প্রাচীন চিত্রগুলিকে দ্রাবিড় যুগের বলেই মনে হয়েছিল। আরবিক সভ্যতার কোন নিদর্শন তাতে নেই। স্তম্ভটি দেখে মনে হল এতে কোনরূপ খামখেয়ালির অবসর নেই। উন্নত শীর্ষে দাঁড়িয়ে থেকে সে শুধু জয়ের বার্তাই ঘোষণা করেছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে যখন স্থলতান মামুদের কীর্তিস্তম্ভ দেখছিলাম তখন একজন পাঠান বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় আমাকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, ঐ যে স্তম্ভটা দেখছেন এটা স্থলতান মামুদ ভারত বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ গড়ে গেছেন। পাঠানকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললাম, গজনী ভারতের বাইরে নয়। ভারতের ভেতরে থেকে ভারত জয়ের স্মৃতিচিহ্ন গড়ে তুলবার কোন মানে হয় না। আবার যখন নতুন নব যৌবন নিয়ে পদার্পণ করবে তখন এই স্তম্ভকে টেক্কা মেরে আর একটা স্তম্ভ হয়তো তৈরি হবে। পুরাতন আইডিয়া আজও যাকে জয়স্তম্ভের সম্মান দিচ্ছে, আগামী দিনের নতুন আইডিয়া তাকে হয়তো ধূলিসাৎ করে দেবে।

আমান উল্লা ছিলেন নতুনের—অগ্রদূত। তিনি নতুনের চিহ্ন রেখে গেছেন মাত্র। আবার যখন নতুন উদ্যমে নতুন এসে প্রবল ধাক্কা দেবে তখন হয়তো আর পুরাতন টিকতে সক্ষম হবে না। আপনারা নতুনের জন্য অপেক্ষা করুন। আমার কথা শুনে পাঠান রুষ্ট হলেন না। আমার হাত ধরে নিকটস্থ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

মন্দির পুরাতন। শিবের মন্দির। মন্দির পাথরের, শিবও পাথরের। পাথরের মন্দির ও দেবতা আমার প্রাণে ভক্তিরসের সঞ্চার করল না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঐ যে পূজারী ঠাকুরটি মন্দিরের একপাশে বসে গাঁজার কলকেতে দম দিচ্ছে তাকে দেখে আমার মনে প্রচুর কৌতুক রসের উদয় হল। যুগযুগান্ত ব্যাপী ঐসলামিক প্রাবল্যকে ঘোষণা করছে সুলতান মামুদের যে জয়স্তম্ভ তারই কাছে বসে গাঁজা ফুঁকাও বীরত্বের পরিচায়ক। গাঁজাখোরের সংগে কথা বলতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু গেঁজেল কথা বলতে রাজী ছিল না। যা হোক আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম মন্দির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সে কিছু জানে কিনা, তখন সে পোস্ত ভাষায় জবাব দিল যে সুলতান মামুদের জয়স্তম্ভের ইতিহাস আছে, কিন্তু এই শিবমন্দিরের ইতিহাস কিছুই নেই। মানুষের সভ্যতার সংগে সংগে এর জন্ম হয়েছিল এবং মানুষের ধ্বংসের সংগে সংগেই এরও ধ্বংস হবে। গেঁজেলের কথায় আমার হাসি পেল খুব কিন্তু আমি ভবঘুরে, শুনে যাওয়াই আমার কাজ। যা শুনেছি তাই যদি বলতে পারি তবেই আমার কাজের পরিসমাপ্তি।

প্রবল বেগে হাওয়া চারদিকে বয়ে চলছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। শিবমন্দিরের চারদিক ঘুরে ফেরবার বেলায় পাঠান আমাকে বললেন, আসুন এবার

গজনীতে স্থলতান মামুদের দ্বারা নির্ম্মিত স্তম্ভ
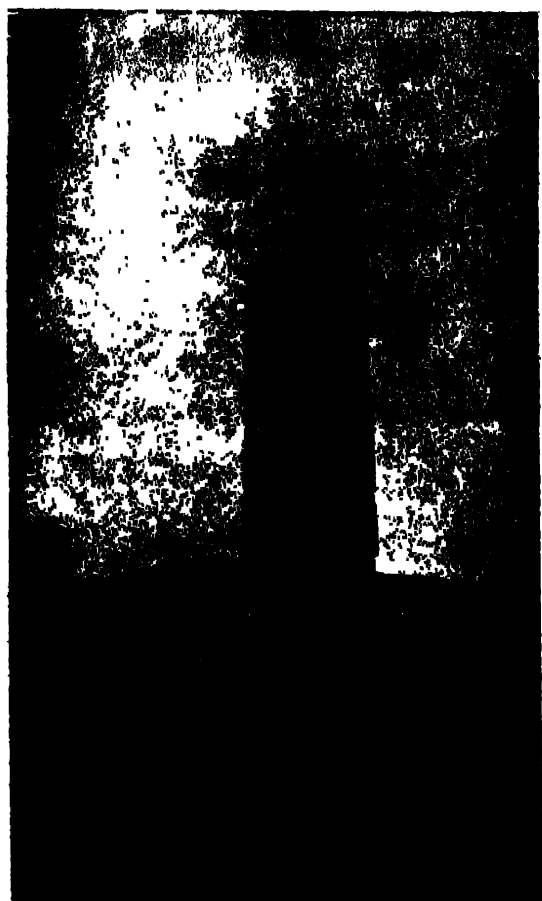
আমাদের গ্রামে যাই। পাঠানের গ্রামে গেলাম। পাঠান আমাকে একজোড়া দস্তানা উপহার দিয়েছিলেন। পাঠান আমাকে তাঁর বাড়ি বসালেন। তাঁর সংগে কথা হল। পাঠান বললেন, গজনী শহরের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। এখানে অনেক বিদেশী এসে বসবাস করেছে বটে কিন্তু কেউ বেঁচে থাকতে পারেনি। তাদের মাঝে পুরাতন অধিবাসী যারা টিঁকে আছে তারা ঐ জনকএক হিন্দুই। অন্যান্য যাদের দেখছেন তারা অন্যান্য স্থান হতে এসে নতুন বসবাস করছে। কতবার যে এ শহরের লোক নির্বংশ হয়েছে তার হিসাব করা যায় না। শেষবার যখন গজনীর লোক নির্বংশ হয় বরফপাতে, তখন এমনি ভাবে বরফ পড়তে লেগেছিল যে কেউ ঘরের চালের ওপরের বরফও পরিষ্কার করতে পারেনি। মাত্র একটি মুসলমান পরিবার বেঁচেছিল। আর বেঁচেছিল কতকগুলি হিন্দু। হিন্দুদের বাড়িগুলি পাথরের ছিল তাই তারা রক্ষা পেয়েছিল। যে মুসলমানটি বেঁচেছিল সে ছিল একজন কসাই। সে এক একটি করে দুম্বা কাটত আর তাই ছেলেদের খাইয়ে চালের ওপরকার বরফ পরিষ্কার করতে পাঠাত। এই করেই সে তার ঘর রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

বরফপাত হওয়াটা না হয় আল্লার মরজি, কিন্তু ঘর বানানোটাতো আপনাদের ওপরই নির্ভর করে? পাথরের ঘর তৈরি করেন না কেন?—আমি বললাম।

পাঠান আমার কথার উত্তর দিতে পারেন নি। বুঝলাম আসল কথাটা কি! যেহেতু হিন্দুরা পাথরের ঘর তৈরি করে বাস করে অতএব মুসলমানের পাথরের ঘরে বাস করতে নেই, এ ছিল কএকজন অজ্ঞ মোল্লার আদেশ। সেই আদেশ মানতে গিয়েই এই বিপদকে ডেকে আনা হয়েছিল।

গজনীতে মুসলমানই বেশি। তবুও হিন্দুর প্রতি এদের এত আক্রোশ কেন তা অবগত হওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করেছিলাম। জেনেছিলাম এখানকার হিন্দুরা পয়মাল প্রকৃতির। পয়মাল মানে শূকর। শূকর জানে আক্রমণ করতে, মরতে আর মারতে। এখানে হিন্দুরাও সেরূপ। এদের কোনরূপ জ্ঞান নেই। তারা দরকার হলে আক্রমণ করে, মরে এবং মারে। অতএব এরূপ লোকের রীতিনীতি গ্রহণ করা নিশ্চয়ই অন্যায়।

বিকাল বেলা স্থানীয় পুলিশ অফিসারের সংগে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনিও আমাকে আদর আপ্যায়ন করেছিলেন। তাঁর মনের ভাবটা কিন্তু অন্য রকমেরই মনে হল। তিনি দেশটাকে বর্তমান প্রথামতে চালিত করতে চান, কিন্তু কি জানি কি এক অজ্ঞাত শক্তি যেন তাঁকে বাধা দিচ্ছে বলেই তিনি মনে করেন। মোল্লাদের তিনি মোটেই দোষ দেন না। তিনি বলেছিলেন, মোল্লারা হল নিরীহ লোক। তাদের পরিবর্তন করতে এক মিনিটেরও দরকার হয় না। কিন্তু মোল্লাদের নিরীহ ভাব লোপ করে সিংহভাব এনে দেবার মত শক্তি বিদেশ থেকেই আসছে। ইরান, তুর্কী এরা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হল, কিন্তু আমরা পারছি না কেন? মোল্লা তাতে কি বাদ সাধতে পারে? মজরা সরিফ, খরকা সরিফ মামুলী মসজিদে পরিণত হতে কোন মোল্লা বাদ সাধেনি। আবার রাজার আদেশে খজরা সরিফ খরকা সরিফ তাদের স্বরূপ পেয়েছে। রাজার মর্জির ওপরই ধর্মের গ্রহণ এবং বর্জন নির্ভর করে। আমাদের রাজা হলেন স্বাধীন দেশের পরাধীনতার স্তম্ভ। বাফার স্টেটগুলিতে তাই হয়ে থাকে। আমাদের উন্নতি এবং অবনতি রুশ এবং বৃটিশের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে। ইনটারন্যাশনাল পলিটিক্সের পরিবর্তনের সংগে সংগে আমাদেরও পরিবর্তন হবে।

আমি অফিসারের কথা শুনে গেলাম। মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক হাঁ হুঁ বলে যেতে লাগলাম। তারপর সেখান হতে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমার পায়ে আবার ভয়ানক ব্যথা শুরু হল। ফের লবণযুক্ত গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে বাধ্য হলাম। কিন্তু হোটেলের একটি বয় আমাকে বড়ই বিরক্ত করছিল। আমি শেষে তাকে বললাম, এখান হতে যদি না যাও তবে আমি চিৎকার করে পুলিশ অফিসারকে ডাকব। সে পুলিশ অফিসারের ভয়ে তৎক্ষণাৎ রুম পরিত্যাগ করল।

পরদিন অসুস্থ শরীর নিয়েই গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

ছয়

আজ আমরা যাব মুকুর নামক স্থানে। পথের অবস্থা খারাপ। চারদিকে যে দিকেই তাকাচ্ছিলাম সর্বত্রই বরফে ঢাকা দেখতে পেলাম। কিন্তু এক অপূর্ব চিন্তায় আমি বিভোর হয়ে পড়লাম। মুকুরের কাছে একটা বহুপুরাতন শিবমন্দির আছে তা দেখব বলেই আমি সকল দুঃখ ভুলে গেলাম। মুকুরে পৌছার পর আমরা একটি সরাইএ উঠলাম। কিন্তু সকল কাজ স্থগিত রেখে একজনমাত্র লোক সংগে নিয়ে আমি শিবমন্দির দেখতে গেলাম। বৌদ্ধ যুগের অনেক বৌদ্ধ মন্দির শিবমন্দিরে পরিণত হয়েছে তা আমি জানতাম। কিন্তু এ মন্দির দেখে মনে হল এটা বৌদ্ধযুগেরও আগে তৈরী হয়েছিল। এতে বৌদ্ধ যুগের স্থপতিবিদ্যার কোন নিদর্শন নেই।

মন্দিরটি পাহাড়ের গায়ে নির্মিত হয় নি। পাহাড় যেন মন্দিরটিকে ঢেকে রেখেছে। দেখলেই মনে হয় এস্থানটা মনকে স্থির ধীর করবার

পক্ষে প্রশস্ত। একদিকে একটি প্রস্রবণ, যদিও তার জল বরফ হয়ে গেছে, আর অন্য তিন দিকে পাহাড়। শিবলিংগটি আমাদের দেশের শিবলিংগের মত নয়। একটি লম্বা পাথর মাত্র, এবং পাথরের বুকেই খোদিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মন্দিরটি পাহাড় কেটেই করা হয়েছিল। তাতে অন্য পাথরের কোনরূপ সংযোগ হয়নি। এরূপ মন্দির পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে কি না তা বলা যায় না। তাজমহলের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে সংযোগ বিয়োগের নিপুণতায়, কিন্তু এ মন্দিরে সংযোগ নেই শুধু বিয়োগ। তার দরজা নেই। দরজা করতে হলে সংযোগের দরকার। অতি কষ্টে মন্দির দেখা শেষ করে গ্রামে এলাম। রাত্রে যদিও পায়ের ব্যথা বেড়েছিল, তবুও মুসাফিরখানার পাঠানদের ম্যাসেজে এবং ক্রমাগত গরম জল ব্যবহারে পায়ের অবস্থা বেশ ভালই মনে হয়েছিল।

মুকুর হতে রওয়ানা হয়ে এলাম খালাত নামক স্থানে। এখানে আমাদের দুদিন থাকতে হয়েছিল। আমরা যে ঘরটাতে ছিলাম তথায় একজন পাঞ্জাবী হিন্দুও আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি আফগানিস্থানে মোটর চালাবার আদেশ পেয়ে নিজেই মোটর চালিয়ে দুপয়সা রোজগার করেছিলেন এবং এদেশেই বর্তমানে থাকছেন। তিনি বিয়ে করেন নি। তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছিল তিনি একজন বিদ্বান লোক। আমি যে অসুখে কষ্ট পাচ্ছিলাম তিনিও সে রোগেই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর সংগে দুটি লোক ছিল, একটি ককেশিয়ার, অন্যটি আর্মেনিয়ার। ককেশাস এবং আর্মানীদের ভাষার মাঝে কি পার্থক্য জানা ছিল না, তবে আর্মানী লোকটি তুরুক-বিদ্বেষী এবং ককেশাস লোকটি ধর্ম-বিদ্বেষী ছিল। এরা বেশ ইংলিশ বলতে পারত।

কোন সময়ই কারো সংগে উপযাচক হয়ে কথা বলতে আমি আগ্রহ প্রকাশ করি না। হিন্দু ভদ্রলোকের শরীর অসুস্থ থাকায় আমাকে তারই

বিছানার কাছে একটা বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরই সংগে বেশি সময় কথা বলেছিলাম। আমার পায়ে ব্যথা হয়েছে জেনে তিনি তৎক্ষণাৎ দুজন রুশ দেশীয় লোককে আমারও পায়ের ব্যথা যাতে সত্বর আরাম হয় তার ব্যবস্থা করতে বললেন। তারা দুজনায় মিলে আমার সমুদয় শরীর ম্যাসেজ করে দিলেন। পায়ে ক্রমাগত গরম জলের সেক দিতে লাগলেন আর আমি ধীরে ধীরে আমার ভ্রমণকাহিনী তাদের বলতে লাগলাম।

দ্বিপ্রহরে আলু পেঁয়াজের তরকারী, দই এবং রুটি এনে চার জনে খেলাম। এই দুটি রুশ দেশীয় লোকের ভদ্র ও সদয় ব্যবহার আমার কাছে ভাল লাগছিল। তারা অনেক সময়ই আমার সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে দিতেন। আমার ভ্রমণকথা শুনে তারা সুখী হয়েছিলেন। আমি কিন্তু সকল সময় নিজকে অভারতবাসী বানিয়ে রাখতে পারছিলাম না। হঠাৎ মুখ হতে বের হয়ে পড়ল, তবে কেন এরা রুশ দেশ পরিত্যাগ করে এ দেশে এসেছে? বাস্তবিকই কথাটা আমার অনিচ্ছায়ই মুখ হতে বের হয়ে পড়েছিল। কোন কোন শব্দের ব্যবহার আমরা প্রায়ই অনর্থক করে থাকি। পাঞ্জাবী হিন্দু ভদ্রলোক আমাকে উর্দুতে বললেন, এরূপ কথা মুখে আনবেন না। এখানে এরূপ বলা আপনার অন্যায় হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, বন্ধুগণ আমাকে ক্ষমা করবেন। এটা আমার পরাধীনতাসুলভ বদভ্যাস। আমার দোষ আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই বোধ হয় তারা আরও আনন্দিত হয়েছিলেন।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক রুশ দেশের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবং তাঁর সংগের দুজন লোক এদেশে আগত, পলাতক রুশদেরে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিলেন। যে সকল ইহুদীর কথা পূর্বে বলেছি

তাদের মাঝে কএকজন ইহুদী ছিল বটে কিন্তু অন্যটি আর্মানী এবং ককেশাসবাসী। আফগানিস্থান হতে ভারতে প্রবেশ করার জন্য এরা চেষ্টা করতে কসুর করেনি কিন্তু ওদের যেতে দেওয়া হয়নি। এরা যখনই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কথা বলে তখনই আগে কমিউনিজমকি তা বলার পর সেই মতবাদকে অন্য যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে। যদি কমিউনিজম-বিরোধী এই রুশরা ভারতে আসত তবে এদের কাছ থেকেই অনেকে প্রকৃত কমিউনিজম কি তা শিখে যেত। এই বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্যই বোধ হয় এদেরে ভারতে আসতে দেওয়া হয়নি।

সুখের বিষয় এদের মতিগতি ফিরছে। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এবং অন্য দুজন রুশ দেশীয় লোক—এই তিন জনে মিলে পলাতকদের বস্ত্র খাদ্য এবং অর্থ বিতরণ করছিলেন। কাবুলে এদের দুরবস্থা দেখতে পেয়ে আমি কেঁপে উঠেছিলাম। স্বীয় মতবাদ বজায় রাখতে মানুষ যে কত দুর্দশা অম্লান বদনে বরণ করতে পারে, সাদা (পলাতক) রুশরা তার একের নম্বর দৃষ্টান্ত। কিন্তু এদের হঠাৎ মত বদলাবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় একজন বললেন, হঠাৎ এদের মত বদলেনি। এদের মাঝে রীতিমত প্রচারকার্য চালান হয়েছিল তারই ফলে তারা স্বেচ্ছায় মত বদলিয়েছে। ভারতীয় ভদ্রলোক বললেন, এদুজন ভদ্রলোকই এদের পরিবর্তনের একমাত্র কারণ। আমি উভয়কে মনেপ্রাণে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। শুনলাম এদেশে যত পলাতক রুশ আছে তারা সত্বরই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। কান্দাহারে গিয়ে একজন পলাতক রুশের পোশাক পরিবর্তন্ দেখে মনে হয়েছিল সে যেন নবজীবন ফিরে পেয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রুশ দেশে যাবার জন্য তার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে কি? সে বলেছিল, মানুষ

চায় কাজ এবং কাজের উপযুক্ত মজুরী। রুশদেশে তা পাওয়া যায়। এখন ধর্ম সম্বন্ধে কি করবে জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলেছিল, এটা হল ব্যক্তিগত বিষয়। আমি যদি মনে মনে প্রার্থনা করি তবে কেউ জানবে না। একদিন ধর্মের জমায়েত লোক সমাজের উপকারী ছিল, বর্তমানে তার দরকার নেই। জ্ঞান অর্জন মনের মাঝেই হয়, বাইরের বেখাপ্পা আচার ব্যবহারের ভেতর তা প্রকাশ পায় না।

দুদিন এদের সংগে কাটিয়ে তৃতীয় দিন রাত্রি দশটার সময় কান্দাহার পৌছলাম।

কান্দাহার

এক

কান্দাহার একটি ছোট শহর। দুটি মাত্র বড় পথ তাতে আছে। ছোট ছোট অলিগলির কথা এখানে না বলাই ভাল, কারণ সেই ছোট পথগুলির সংগে কলকাতার যে কোন কানা গলির তুলনা হতে পারে। কান্দাহার আফগানিস্থানের সব চেয়ে পুরাতন বসতি। কান্দাহার বাণিজ্যস্থান। বোখারা খোরাসান দামাস্কাস যেমন নানা মতে মধ্য-এশিয়ার লোকের কাছে পরিচিত, এই স্থানটিও ঠিক তেমনি ভাবে লোকসমাজে পরিচিত। ইরান হয়ে যত ভারত-আক্রমণকারী ভারতে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই কান্দাহারে প্রথম আড্ডা গাড়তেন। কাবুলের ওপর যত বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে তার চেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছে কান্দাহারের ওপর। কান্দাহার ভারতের একটি দরজা। কান্দাহারকে বিদেশ বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কান্দাহার ভারতেরই একটা অংশ।

কান্দাহারে নানাশ্রেণীর লোক মিশে গিয়ে ইসলাম সভ্যতা মতে একটি সমাজ গড়ে তুলেছে বটে, কিন্তু সে সভ্যতা সেখানে খাপ খায়নি। ধার করা সভ্যতা সহজে ধাতস্থ হয় না। অবশ্য তা নিয়ে আমি এখানে মাথা ঘামাব না, কারণ পৃথিবী পরিবর্তনশীল। আজ যা দেখে আমি বলছি ধাতস্থ হয়নি, আর ক বৎসর পর তা ধাতস্থ হবে, তারপর সেই ধাতস্থ জিনিসও একদম লোপ পেয়ে নতুন হয়ত একটা কিছু গজাবে। তার ইংগিত আমি পেয়েছি বলেই কথাটা বলছি।

কান্দাহার চুনা পাথরের ওপর অবস্থিত। কোনদিন একটা ভূমিকম্প হয়ে এখানে একটা হ্রদ হয়ে যায় তারও সম্ভাবনা আছে। আমি স্বচক্ষে সেরূপ প্রমাণ অনেক দেখেছি। কান্দাহার ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে, ধ্বংসের পথে যাবে কি নতুন সৃষ্টির দিকে যাবে তা গবেষণামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করে বলা আমার শক্তির বাইরে। তবে পর্যটক হিসাবে আমার যা ধারণা হয়েছে তারই ইংগিত দিলাম মাত্র।

রাত্র দশটার সময় শহরে পৌছে একটি হিন্দুর সংগে পথের মাঝেই পরিচিত হলাম। সেই লোকটি আমাকে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খাবার এবং থাকার বন্দোবস্ত করে দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন আমি গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলাম তখন গৃহস্বামীর ভ্রাতার নিমুনিয়া রোগে মৃত্যু হয়। সকাল বেলা আমাকে জানান হল যে তাঁর ভাই প্রেতগ্রস্ত হয়েই মারা গেছেন। এটাও যেন বুঝান হল যে গৃহস্বামীর ভ্রাতার হন্তারক প্রেতটি আমার সংগেই এ বাড়িতে আগমন করেছিল। পরে আরও অবগত হলাম, যারা ভূপর্যটন করে এদের মতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ভূত প্রেতই করে থাকে। হয়তো আমি কোন ভূতের বিরাগভাজন হয়েছিলাম, সেজন্যই ভূতটি আমার আশ্রয়দাতার ভ্রাতাকে নিকটে পেয়ে তাকেই প্রাণে বধ করেছে। যা হোক সকালেই আমাকে নিকটস্থ শিব মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হল। অতএব যদি কোন ভূত আবার আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয় তবে শিবের ঘাড়েই চাপবে। আমিও শিব মন্দিরে এসে অনেকটা আরাম পেলাম। কারণ ভূতনাথের পূজারী বাবা ভোলানাথ একজন প্রগতিশীল লোক। তিনি ভূত প্রেত এসব তো বিশ্বাস করেনই না, তারপর আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আরও অনেক কিছুই মানেন না, আমি যা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমি শিব মন্দিরে

এসে ফের নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগলাম। ভূতে পাওয়া মৃতের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার আমার সময় হয়নি।

দ্বিপ্রহরে ভোলানাথ আমাকে ডেকে উঠিয়ে খাওয়ালেন। আমি খেয়েদেয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়লাম। দুদিন কোথাও যাইনি কারণ দুদিন আমার পা মোটেই ভাল ছিল না। তৃতীয় দিন বিকাল বেলা ভোলানাথের আড্ডায় এসে বসেছি এমন সময় একজন লোক প্রস্তাব করলেন যে আমার রুশ দেশীয় গরম জুতা ব্যবহার করা কর্তব্য। তৎক্ষণাৎ একজন লোক বাজারে গিয়ে আমার জন্য একজোড়া গরম রবারের জুতা কিনে আনল। শীতের সময় রবারের জুতা বরফ হতেও ঠাণ্ডা মনে হয়, আবার গরমের সময় মনে হয় যেন আগুনের মত। কিন্তু রুশ বৈজ্ঞানিক যে রবারের জুতা তৈরী করেছেন তা শীতের সময়ও পা বেশ গরম রাখে। জুতা পায়ে দিয়ে বুঝলাম রুশ জাত জুতার মাঝে শুধু গরম টেনে আনেনি, আরামও টেনে এনেছে। কএকদিন মাত্র ঐ জুতা ব্যবহার করেই পায়ের ব্যথা হতে মুক্তি পেয়েছিলাম।

দুই

কান্দাহার হতে একটি মোটা পথ চামনের দিকে চলে গিয়ে বর্তমান ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। চামন হতে কোয়েটা হয়ে রেল লাইন ধরে ভারতের যথা ইচ্ছা তথায়ই যাওয়া যায়। চামনই হল ভারতের সীমান্ত। চামন হতে সাত মাইল দূরে একটি কেল্লা আছে তার নাম বুলডগ ফোর্ট। কান্দাহার এবং গজনীর মাঝে হিন্দুর একটি পীঠস্থানও আছে। আমার মনে হয় একলিংগের মূর্তিই সেই পীঠস্থানের দেবতা। পীঠস্থানের মহিমা কত তা ধার্মিকগণ ঠিক করবেন। কিন্তু ভারতের

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মাঝে যারা একান্ত বেপরোয়া তাদের অনেকেই সেই পীঠস্থানের দিকে যেতে গিয়ে সীমান্ত আইন লংঘন করে বিপদে পড়ে। সীমান্ত আইন ধর্মের দোহাই কিংবা অজ্ঞতার যুক্তি গ্রাহ্য করে না। সেজন্য অনেকেই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কলিযুগকেই দোষী সাব্যস্ত করে সান্ত্বনা লাভ করেন।

যাকগে, সময়মত দুটি একগুঁয়ে সন্ন্যাসীর কথা বলব। আমি যখন পায়ের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম তখন এই পথেই দেশে ফিরে আসার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু উপযুক্ত ঔষধ পেয়ে যাওয়ায় আমাকে এই পথে ভারতে ফিরতে হয়নি, আমি হিরাতের দিকেই গিয়েছিলাম।

শরীর ভাল হবার পরই কান্দাহারের গভর্ণরের সংগে সাক্ষাৎ করি এবং পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম তার কথা বিশদভাবে বলি। এখানকার সরকারী অফিসারগণ সকল সময়ই পর্যটকদের সংবাদ সংগ্রহ করতে পছন্দ করেন। সংবাদ আদান-প্রদান হয়ে গেলে গভর্ণর আমাকে স্থানীয় খরকা সরিফ, বুদ্ধ মূর্তি এবং অন্যান্য কটি বিশিষ্ট স্থান দেখতে বলেন। আমিও তদনুসারে সর্বপ্রথম খরকা সরিফ মসজিদ দেখতে গেলাম।

এই মসজিদটি শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত। মসজিদের সামনে একজন মোল্লা বসে থাকেন। তিনি শুধু দেখেন কোন রাজকীয় কর্মচারী মসজিদে প্রবেশ করে কাউকে ধরে নিয়ে গেল কিনা। মসজিদে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যেতে পারে, থাকতেও পারে। এই মসজিদের একটি বিশেষত্ব হল এই যে, যদি কোন লোক কোন অন্যায় কাজ করেও রাজদণ্ড হতে রেহাই পেতে চায় তবে এখানে এসে আশ্রয় নিলে রাজার ক্ষমতা নেই সেই দোষী ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে সাজা দেয়। যদি কোন হিন্দু কোন মুসলমানকেও হত্যা করে এই মসজিদে আশ্রয় নেয়,

তবুও মোল্লার ক্ষমতা নেই যে হিন্দুটিকে তাড়িয়ে দেয় অথবা তাকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে। প্রকৃতপক্ষে নরহত্যাকারী ঠগ এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারীরাই এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই তিন দোষেই লোকের প্রাণদণ্ড হয়ে থাকে।

আমান উল্লার রাজত্বকালে তিনি খরকা সরিফের মাহাত্ম্য নাকচ করে দেন, বাচ্চা-ই-সাকো সময় পাননি বলেই খরকা সরিফ ভূপৃষ্ঠ হতে লোপ পায়নি। নাদির শাহ খরকা সরিফের লুপ্ত অধিকার পুনর্বার ফিরিয়ে দেন।

আমি যেদিন খরকা সরিফে গিয়েছিলাম সেদিন একজন হিন্দুকে সেখানে আশ্রয় নিতে দেখতে পেয়েছিলাম। সে একটি মুসলমানকে তিন হাজার টাকা ঠকিয়েছিল। ভোলানাথের কাছে ফিরে এসে হিন্দুটির কুকর্মের কথা বলায় তিনি তিন হাজার টাকা প্রতারক হিন্দুটির হয়ে মুসলমানকে দিয়েছিলেন। তারপর প্রবঞ্চকের পাপের শাস্তি বিধান হল। সে এমন কাজ আর করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং স্বহস্তে পাঁচ জুতা নিজের মাথায় লাগিয়েছিল।

আফগানিস্থানে সমাজের শাসন কড়া বলে তথাকার ভিক্ষাজীবিদের বড়ই দুর্দশা। ভিক্ষাতে ভিক্ষুকের পেট ভরে না। বস্ত্রের যোগাড় হয় না। গৃহের অভাব বেশ ভাল রকমই রয়েছে। এরূপ অবস্থায় ঠাণ্ডা দেশের গরিব লোককে ভয়ানক কষ্ট পেতে হয়। এ কথাটা বোধ হয় আমান উল্লা ভাল করেই বুঝেছিলেন, সেজন্যই দেশের যাতে সত্বর উন্নতি হয় তার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। আমার মনে হয় বাচ্চা-ই-সাকো আরও বেশি টের পেয়েছিলেন দারিদ্র্য কাকে বলে। সেজন্যই বোধ হয় তিনি আমান উল্লার চেয়েও দ্বিগুণ উৎসাহে এবং দ্রুত দেশের দারিদ্র্য মোচন করতে গিয়ে বিদেশীর বিরাগভাজন হন। লোকে বলে

থাকে, একদিন জনৈক হিন্দু পুঁজিপতি নাকি বাচ্চা-ই-সাকোকে ভয় দেখিয়ে বলছিলেন, রাজত্ব করতে পার বটে কিন্তু রাজত্ব চালাতে হলে আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। তখন বাচ্চা-ই-সাকো তার কাছে না যাবার জন্য নোট তৈরী করেন এবং সেই নোট নিতে জন-সমাজকে বাধ্য করেন। আফগানিস্থানে এখনও নোটের চলন হয়নি। আফগানিস্থানেরও আমূল পরিবর্তন অবশ্যই হবে এই যুদ্ধের পর। কএকজনকে আমি বলতে বাধ্য হয়েছিলাম কাবুল খাসগায় নয়। খাসগারে তিন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল সেজন্যই তথায় ষ্টালিন কৃতকার্য হন। খাসগারের অবস্থার সংগে কাবুলের মোটেই তুলনা করা যেতে পারে না।

পুরাতন বৌদ্ধ যুগের স্থপতিবিদ্যা দেখার জন্য বেরিয়েছিলাম। পথে দেখা হয়েছিল কএকজন পাঞ্জাবী মোটর ড্রাইভারের সংগে। ওদের কথায় বুঝলাম, এরা আর দেশে যাবে না, সুযোগ পেলেই রুশ দেশে যাবে। দেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, পাঞ্জাব যদিও বেশ সুন্দর দেশ, খাদ্যের অভাব নেই, তবুও সেখানে থাকবার মত সংস্থান না থাকলে কোন মতেই সেখানে বাস করা উচিত নয়। কটা সরকারী চাকুরি আছে যা নিয়ে কামড়াকামড়ি করা যাবে? কাজ আছে, মজুরি নেই। সিনেমা আছে, দেখবার পয়সা নেই। শরীর আছে, শরীরে শক্তি আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে কিন্তু তার সদ্ব্যবহারের স্থান নেই। ড্রাইভারগুলি সবাই মুসলমান। তাদের আমি বললাম, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া, আর দেশকে অপরের উন্নত দেশের মত গড়ে তোলা এ দুটার মধ্যে যা ভাল তাই করবেন। রুশ দেশ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে অনেক রক্ত খরচ করেছে। আপনারা "সাজানো বাগানে গিয়ে বসতে, সেরূপ সাজানো বাগান নিজ দেশে

তৈরি করলেই সকল দুঃখের অবসান হবে। একজন রাগ করে বললে, আরে বাবু তুম সমঝাতা নেই কুছভি, মুল্লুকমে মজবকা বদখেয়ালি হটানা বহুত মুস্কিল। ওদের কথা শুনে আমি হাসছিলাম আর ভাবছিলাম, ভারতের সমাজে ধর্ম বেশ স্থান দখল করে নিয়েছে। দেশ হতে পালাচ্ছে এটার দুর্দান্ত প্রতাপ সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছে না বলে।

শহরের বাইরে পাহাড়ের ওপর প্রকাণ্ড একটা বুদ্ধ মূর্তি। মূর্তিটির মুখের দিকটা ভেংগে ফেলা হয়েছে। লোকে বলে শংকরবাদের প্রচার হবার পর এই মূর্তির অনেকটা ধ্বংস করা হয়েছিল। মুসলমান ধর্ম আসবার পর আরও ভাংগা হয়েছে। আজ যাকে মন দিয়ে গড়া হল কাল তাকে কুড়ালের সাহায্যে তাড়াতাড়ি ভেংগে ফেলা হল। এটা হবেই। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। ধর্মগত বিদ্রোহের সংগে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিদ্রোহের যোগ আছে। অর্থনীতি যাতে ভাল ব্যবস্থার ওপর গড়ে ওঠে তারই চেষ্টার সংগে আমরা দেখতে পাই ধর্মের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। বাস্তবিক, ধর্ম হল মানুষের গড়া, তার পরিবর্তন হয়েছে, হবেও, কারণ তার সম্বন্ধ রয়েছে পরিবর্তনশীল সমাজের সংগে।

আমি যখন মূর্তিটির দিকে চেয়েছিলাম তখন কএকজন লোক আমাকে দূর থেকে লক্ষ্য করছিল। আমার দেখা শেষ হয়ে গেলে আমি যখন পাহাড় থেকে নেমে আসলাম তখন দর্শকগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, এই মূর্তির মাঝে কি কিছু আছে? এটা কি একটা ভূত? এটাকে এখনও আফগান সরকার রক্ষা করছেন কেন? এটা তো হিন্দুর ও দেবতা নয়? আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধু বলেছিলাম লেখাপড়া শেখ তারপর সবই জানতে পারবে।

কান্দাহারের বৌদ্ধ মূর্তি

এখানে যে-কটি বিদ্যালয় আছে তাতে উচ্চ শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু দরকারী শিক্ষাই দেওয়া হয়ে থাকে। কএকটি বিদ্যালয় বেড়িয়ে এসে বুঝলাম শিক্ষার মান এখানে বড়ই নীচু। হিন্দুদের ছেলেরা এখানে স্কুলে যায় না, তারা ঘরে বসেই লেখাপড়া করে। এটা কেন করে তা জানতে গিয়ে বুঝেছিলাম আভিজাত্যই তার একমাত্র কারণ। সাধারণ মজুরের ছেলের সংগে বসে লেখাপড়া শিক্ষা করাটাও অন্যায় বলেই এখানকার হিন্দুরা মনে করে থাকেন। আমি একদিন জনৈক হিন্দুকে বলেছিলাম, ঘরে বসিয়ে ছেলেগুলিকে শিক্ষা দেওয়ার ফলে আপনাদের ছেলেদের লোকের সংগে মেলামেশার শক্তি লোপ পাচ্ছে। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে, তা হতেও ছেলেদের বঞ্চিত করছেন। হিন্দু ভদ্রলোক আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি, নীরব থাকতেই পছন্দ করেছিলেন।

আফগানিস্থানেও মধ্য-ইউরোপীয় প্রথামতে ছাত্রদের পৃথক পোশাক পরতে হয়। প্রত্যেক ছেলের মাথায় ফেজ অথবা পাগড়ি না দিয়ে মধ্য-ইউরোপীয় প্রথায় টুপি পরতে হয়। নিয়মটি বড়ই সুন্দর বলেই মনে হল। এখানে কিন্তু কোন ধর্মের আদেশ চলে না। প্রত্যেক ছেলেকে বুট-পট্টি লাগিয়ে স্কুলে যেতে হয়। আফগানিস্থানের শিক্ষা বিভাগে জার্মান, তুর্কি এবং আংশিক ভাবে ফরাসী প্রথা প্রচলিত হওয়ায় স্কুলের মাঝে সাম্প্রদায়িক ভাব মোটেই জাগতে পারে না। উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু ছেলেরাও যায়।

তিন

আমি যখন কান্দাহারে নানা বিষয় জানতে ব্যস্ত ছিলাম, তখন একদিন সকাল বেলা একটি হিন্দু পথে পথে চিৎকার করে বলে যাচ্ছিল, এক বাংগালী বন্দী মর গিয়া, শ্মশানমে চলিয়ে। কথাটা শুনেই ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে বাংগালী বন্দী এল কোথা হতে? ভোলানাথ আমাকে বললেন, যে লোকটি মরেছে সে বাংগালী বলে কোন প্রমাণ নেই, তবে সবাই অনুমান করে লোকটি বাংগালীই হবে নতুবা এরূপভাবে মরত না। ভোলানাথ বলছিলেন, দুটি সন্ন্যাসী সীমান্ত পার হয়ে আফগানিস্থানে প্রবেশ করে। প্রচলিত আইনমতে এসব আইন-ভংগকারীদের কএকদিন জেলে রেখে আবার চামন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এসব লোকের খাবারের বন্দোবস্ত আমরাই করে থাকি এবং যখনই এরূপ লোকের আগমন হয় তখনই জেল-দারোগা আমাদের সংবাদ দেন, কিন্তু এ দুজন লোকের আসার সংবাদ আমাদের দেওয়া হয়নি কারণ তারা নাকি বাংগালী। তারপর কি হয়ে গেল বলতে পারি না, একদিন সব কয়েদি মিলে এদের দুজনাকে বেশ প্রহার করল। তারই ফলে একজনের শরীর রোগাক্রান্ত হয় এবং সেই লোকটি মনের দুঃখেই বোধ হয় কোন ঔষধ না খেয়ে শীতের রাত্রে বরফের ওপর শুয়ে থেকে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। যখন লোকটি শীতের মাঝেও বরফে বসে থাকত তখন কএকজন প্রহারকারী কয়েদি তাদের অপকর্মের জন্য অনুতাপ করে এবং তার কাছে ক্ষমা চায়। আমাদেরও সে সংবাদ দেয়। আমরা তাদের জন্য খাবার পাঠাতে থাকি কিন্তু যাকে বাংগালী বলে সন্দেহ করা হয়েছিল সে আর কিছু খায়নি। এরই মাঝে এই লোকটিকে আবার প্রহার

করবার জন্য যখন কএকটা কয়েদি পরামর্শ করছিল, তখন অন্যান্য কয়েদিরা তাতে বাধা দেয় এবং তাদের কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা করে। সবাই বুঝতে পেরেছিল, জেলের বার থেকে কে অথবা কাহারা বাংগালী কয়েদির জীবননাশের চেষ্টা করছিল।

একদিন স্থানীয় হিন্দুরা যখন অর্ধমৃত লোকটির কাছে খাবার নিয়ে রেখেছিল, তখন কোথা হতে একটা কয়েদি এসে সে খাদ্য কেড়ে নিয়ে যায়। অন্যান্য কয়েদি সেই সংবাদ অবগত হয়ে তাকে শাস্তি দেবার জন্যই অর্ধমৃত লোকটির সেবাকার্যে তাকে নিযুক্ত করে। তাতে ফল খারাপই হয়েছিল। অর্ধমৃত লোকটি দণ্ডিত কয়েদিকে কাছে দেখলেই কি এক অজ্ঞাত ভাষায় গালি দিত এবং হিন্দিতে বলত তুমি আমার সামনা হতে চলে যাও, তুমি পশু, তুমি টাকার গোলাম, তোমার মুখ দেখতে আমার ঘৃণা হয় ইত্যাদি। অন্যান্য কয়েদিরা শেষটায় ঐ কয়েদিকে আর তার কাছে যেতে দিত না। রোগে কষ্ট পেয়ে, না খেয়েই লোকটির মৃত্যু হয়েছে, কে জানে এই লোকটির মৃত্যুর জন্য কে দায়ী।

সেদিনই আমি বৃটিশ কনসালের নিকট বাংগালী বলে কথিত কয়েদির মৃত্যুর কথা উত্থাপন করি। কনসাল একজন ভারতীয় ছিলেন। তিনি মৃত লোকটি বাংগালী বলে অস্বীকার করেন। তাঁর কথার ওপর আমার কোন তর্কই খাটে না। সেজন্য এ বিষয়ে আর বেশি না এগিয়ে গভর্ণরকে বলে কয়ে অন্য কয়েদিটিকে জেল হতে খালাস করে চামন পাঠিয়ে দিলাম। এই কয়েদিটি সত্যই বাংগালী ছিল না, তবে যে লোকটি মরেছিল তার সম্বন্ধে কান্দাহারে গুজব যে ছিল সে বাংগালীই ছিল।

এখানে হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকারের বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

স্থানটি শহরের কাছেই। দারওয়ানটি মুসলমান। সৎকারের স্থানের চারদিকে ফল ও ফুলের বাগান। বসবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। স্নানের জন্ম গরম জলের বড় বড় টব মজুত। কাঠও অনেক জমা করে রাখা হয়েছে। শহরের এত কাছেই হিন্দুদের সৎকারের স্থান থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় মুসলমানরা তাতে কোনরূপ অসন্তোষ বোধ করে না। দারওয়ান শ্মশানভূমির চারদিকের ফলের বাগানের ফল বিক্রি করে বৎসরে প্রচুর টাকা পেয়ে থাকে। আমাকে দেখা মাত্র সে ভেবেছিল আমি হয়তো একজন সেপাই হব তাই প্রবেশ করতে দিতে চাইছিল না। কিন্তু অন্য লোক এসে আমার পরিচয় দেওয়ায় প্রবেশপথ উন্মুক্ত হল।

কান্দাহার এক আজব শহর। এখানে নানারূপ গুজব দেশ-বিদেশ হতে আমদানি হয়ে নতুন আকৃতি ধারণ করে। আমি আড্ডায় বসে তাই শুনতাম। একদিন একজন হিন্দু ভদ্রলোক বললেন, গুজব বিশ্বাস করে ১৯১৭ সালে তিনি প্রায় দুই লক্ষ রুশদেশীয় কাগজের রুবল কিনেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন একদিন কাগজের রুবল বদলি করে সোনা যোগাড় করবেন, কিন্তু দুঃখের সহিত জানালেন এসব কাগজ বর্ত্তমানে দেরাজেই আছে, এক পয়সা দিয়েও তা কেউ কিনবে না। মনের দুঃখে তিনি আমাকে একখানা একশত রুবলের নোট দিয়েছিলেন, তা এখনও আমার কাছে আছে।

আড্ডায় বসে নানারূপ গল্প শুনতাম আর পেয়ালা পেয়ালা করে চা খেতাম। একদিন আড্ডাতে একটা মজার ঘটনা ঘটল। পূর্বেই বলেছি বাবা ভোলানাথ বর্ত্তমান যুগের লোক। তিনি অতীতকে ভুলতে চান আর বর্ত্তমানকে বরণ করতে চান। একজন ভদ্রলোক এসে বাবা ভোলানাথের পা ছুঁয়ে কি বললেন তার কিছুই

আমি বুঝতে সক্ষম হলাম না। ওদের কথা যখন শেষ হয়ে গেল তখন ভোলানাথ বললেন, কি করব ভাই মাথার মাঝে আক্কেল নেই বললেও চলে। ঐ লোকটিও হিন্দু। সে গোপনে একটি বিধবার প্রতি আসক্ত ছিল। স্ত্রীলোকটির সন্তান হবার সম্ভাবনা হয়েছে অথচ এদিকে বিয়ে হবার নামটি নেই। এখন এদের একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে, যদি সন্তানটিকে রক্ষা করতে হয় তবে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান প্রথামতে বিয়ে করা, এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এখানে আর্যসমাজীও নেই যে তারা এর বন্দোবস্ত করতে পারে। যারা আড্ডাতে বসা ছিলেন তাদের সকলকেই স্থানীয় নিয়ম জিজ্ঞাসা করে জানলাম, যদি কেউ গোপনে অন্য স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করে তবে আইনমতে সে-লোক স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। আমি বলেছিলাম স্ত্রীলোকটি বিচারপ্রার্থী হোক এবং কাজি যখন পুরুষটিকে তাকে বিয়ে করতে বলবেন তখন সে যেন তৎক্ষণাৎ রাজি হয়। তখন কথা হবে কোন্ ধর্মমতে বিয়ে করা উচিত হবে? সে যেন তখন মুসলিম ধর্মমতে বিয়ে করতে রাজি না হয়, তা হলে কাজি হিন্দুদের হিন্দুমতে বিয়ে করিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। স্ত্রীলোকটি বিচারপ্রার্থী হয়েছিল। কাজি হিন্দুদেরে হিন্দুমতে বিয়ে করিয়ে দিতে বলেছিলেন। হিন্দুরা রাজি হয়েছিল, বিয়ে হয়ে গেছে বলে স্বীকারও করেছিল, কিন্তু কাজে কিছুই করেনি বলে শুনেছিলাম। অতি কম লোকই এসব ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হয়। অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বিবাহকার্য সম্পন্ন করে। এরূপ করেই কান্দাহারে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমার মনে হয় পঞ্চাশ বৎসরের মাঝেই হিন্দুরা কান্দাহার হতে লোপ পেয়ে যাবে, কারণ এখানে কোনরূপ সামাজিক পরিবর্তন হিন্দুদের মাঝে মোটেই আসছে না।

কান্দাহারে কএকদিন থাকার পরই শরীর সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু হিরাতের পথ তখনও জলে ভর্তি হয়ে রয়েছে। তাই আরও এক সপ্তাহ আমাকে কান্দাহারের পথেঘাটেই বেড়িয়ে কাটাতে হল। এই একটি সপ্তাহ আমি হিন্দুদের সংশ্রবে না কাটিয়ে মুসলমানদের পাড়ায় এবং নিকটস্থ গরিব লোকদের গ্রামেই কাটাতে লাগলাম। আমার ইউরোপীয় পোশাক অনেকেই পছন্দ করত না এবং আমার কাছে অনেকেই বলত এ পোশাক এদেশে ভাল মানায় না। আমি ওদের ধর্মযাযকদের সামনেই বলতাম, এ পোশাকই এদেশের পক্ষে উপযুক্ত এবং যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়েও দিতাম। কর্তৃপক্ষ একদিনও আমার এরূপ বাক্যালাপের কোনরূপ প্রতিবাদ করেন নি, কিন্তু একটি ভারতীয় চাপরাশি একদিন আমার কথার প্রতিবাদ করেছিল। তাকে বলেছিলাম, মনে রেখ এটা হিন্দুস্থান নয়, এখানে গুণ্ডামি করা চলবে না। পেছন দিক হতে ছুরি মারা ভারতেই সম্ভবে। তারপর বলেছিলাম, একথাটা নিশ্চয়ই আমি স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের জানাব। এতে লোকটি থতমত খেয়ে যায়। শুধু কথা বলেই আমি ক্ষান্ত হইনি, আমি তাকে গ্রাম হতে বহিষ্কৃত হবার বন্দোবস্তও করেছিলাম।

আমরা সেদিন এক গ্রামে গিয়েছিলাম বনভোজন করার জন্য। সংগে করে একটা জ্যান্ত মুরগীও নিয়েছিলাম। মুরগীটা হত্যা না করে নিয়ে যাবার একমাত্র কারণ ছিল, আমি দেখতে চেয়েছিলাম গ্রামে মুরগীটার গলা না কেটে এক কোপে কাটলে গ্রামবাসী রাগ করে কি না, তা জানতে। আমার সাথীরা এক কোপে কখনও মুরগী কাটে নি সেজন্য আমাকেই হত্যাকার্য সম্পন্ন করতে হয়েছিল। দুএকজন গ্রামের লোক মুরগী হত্যা দেখেছিল, কিন্তু তারা কেউ কিছু বলেনি।

কান্দাহারের হিন্দুরা বলে, মুসলমানরা তাদের মতে কোন জীবকে হত্যা করতে দেয় না সেজন্ত তারা জীবহত্যা করা বন্ধ করে দিয়েছে। পরে বুঝেছিলাম হিন্দুরা মাংস খেতে খুব ভাল করেই জানে কিন্তু ঠেকায় পড়লেও তারা মুরগী হত্যা করতে সক্ষম হয় না। এরূপ দুর্বল যাদের মন তারাই নিপাত যাবার উপযুক্ত। এরূপ আরামী লোকের নিপাত হওয়াই উচিত।

বলী দ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হয় না। ব্রাহ্মণ একটি সন্তান মাত্র নিজের ঘরে প্রতিপালন করে। অন্যান্ত সন্তান পাড়াপড়শী নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করে, তাদেরই সমাজে রেখে দেয়। এতে ব্রাহ্মণদেরও অর্থাভাব হয় না, তাই নিজেদের স্বার্থের জন্ত ধর্মের নামে সমাজের ওপর ট্যাক্স বসাবার প্রবৃত্তিও ব্রাহ্মণের মনে জাগে না। সেজন্তই বোধহয় সামান্ত দ্বীপবাসীরা ডাচদের নয় বৎসর যুদ্ধে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কান্দাহারের হিন্দু ধনীর দল যদি সংখ্যায় বেড়ে যায় তবেই হবে মুস্কিল। দেশ বিদেশ হতে নানারূপ প্রবঞ্চনায় চালবাজি এরা টেনে আনবে নিশ্চয়ই, কারণ এদের সংখ্যা যতই বাড়বে ততই ব্যবসাক্ষেত্র ছোট হয়ে যাবে। কান্দাহারের হিন্দুরা ভয়ানক ধনী। তাদের কত টাকা আছে নিজেরাই অনেক সময় তার সংবাদ রাখে না। টাকা গুণাটাও তারা পরিশ্রম বলে মনে করে। একদিন একজন ধনী আমার ভ্রমণের সাহায্যার্থ কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই থলিটাতে কত টাকা আছে? তিনি বললেন গুণে আনিনি। থলিটাতে যা থরেছে তাই নিয়ে এসেছি। অবশ্য আমি তা গুণে পাঁচ শতেরও বেশী পেয়েছিলাম।

আমি ধনলোভী কখনও ছিলাম না। কান্দাহারে যা পেয়েছিলাম কান্দাহারেই খরচ করেছিলাম। আমি ভাবতাম বেশি টাকা হাতে হলে

আর ভ্রমণ করা আমার বারা হবে না। সেজন্যই টাকা খরচ করে ফেলতে বাধ্য হতাম। অনুভব করেছি, যখনই অনেক টাকা আমার হাতে জমা হয়ে গেছে তখনই ডাকাতের ভয় আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। ডাকাতের ভয়কে দূরে রাখবার জন্যই টাকাকেও দূরে রাখতাম।

গ্রামের কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা শুরু করেছি। গ্রামের লোক দেখতে বড়ই নিরীহ কিন্তু তাদের মন নিরীহ নয়, সজাগ এবং সাহসী। আবাদী ভূমি কোন মতেই কারো কাছে ছেড়ে দিতে তারা রাজি নয়। আবাদী ভূমি নিজের হাতে রাখবার জন্য সর্বদাই শস্য বীজের মত তার ঘরে অস্ত্রও মজুত থাকে। দরকার হলে গ্রামকে গ্রাম ছাউনীতে পরিণত করতে পারে। গ্রামের লোক সুখী তবে তাদের প্রাচুর্য নেই। গ্রামে ধর্মের গোঁড়ামি নেই। গ্রামের লোক সহনশীল এবং কর্মতৎপর। তারা শহরের মোল্লাদের মত মালা টপকাবার ফুরসত পায় না। মালা টপকানোটা আফগানিস্থানে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কেউ একটু আয়েসী হয়েছে সেই মালা কিনে টপকাতে শুরু করে দেয়। রাজকর্মচারী হতে সাধারণ ধনীও তা হতে বাদ পড়েনা। যে কটি দিন গ্রামে ছিলাম সে কটি দিন আনন্দেই কেটেছিল।

গ্রাম হতে ফিরে এসে আড্ডায় বসে আছি এবং কান্দাহার ছেড়ে হিরাতের দিকে যাবার কথাই ভাবছিলাম এমন সময় ইয়াকুব এসে হাজির হল। তাকে দেখেই আমার ইচ্ছা হল কাছে এনে বসাই কিন্তু আমাকে সে যে পরিচয় দিল তাতে তাকে কাছে এনে বসাতে পারলাম না। সে সহকারী মোটর ড্রাইভারের কাজ নিয়েছে। সে এখন সাধারণ মজুর। সে কৃষকও নয়। সহকারী মোটর ড্রাইভারের কাজ যারা করে তাদের অনেক সময়ই লোকে অসৎ চরিত্র বলে গণ্য করে। সুতরাং

প্রচলিত ধারণায় ধরে নিতে হবে ইয়াকুব এবার একটি অসৎ লোকে পরিণত হয়েছে। সে আমাকে বললে, শুনেছি আপনি নাকি হিরাত যাবার মোটর খুঁজছেন, আমাদের একখানা মোটর আছে। আমি তার সংগে তৎক্ষণাৎ মোটরের ভাড়া ধার্য করে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে তার মোটর কোথায় আছে দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আড্ডা হতে বের হয়ে এসেই ইয়াকুবকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কেমন আছে, এতদিন কোথায় ছিল ইত্যাদি? সে আমায় জানালে লেখাপড়া যা শিখেছে তাই যথেষ্ট, এখন সমুদয় আফগানিস্থান বেড়িয়ে তারপর সীমান্ত দেশগুলি দেখে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। সেজন্যই সে একাজটা জুটিয়েছে। ছাত্রজীবনে ঘুরে বেড়ানোটাও যে একটা পাপ।

মোটরের আড্ডা বেশি দূরে ছিল না। আমরা তথায় গিয়ে কএকজন আফগান ড্রাইভারকে জুয়া খেলায় ব্যস্ত দেখতে পেলাম। তারা অনেকেই ভেবেছিল আমি একজন সরকারী কর্মচারী হব, কিন্তু ইয়াকুব আমার পরিচয় দেওয়ায় তারা আবার নিশ্চিন্ত মনে জুয়ায় মেতে উঠল। মোটরের আড্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না। পথে এসে ইয়াকুবকে বললাম, এদের হাত হতে তোমাকে বাঁচতে হবে। যদি না বাঁচতে সক্ষম হও তবে ভবিষ্যতের আশা ভরসা চিরজীবনের তরে লোপ পাবে। সে ঘাড় নেড়ে আমায় জানালে, যদিও সে তথাকথিত হীনবৃত্তি অবলম্বন করেছে, তবুও মনের মাঝে বৃহৎ ভাবধারা জাগিয়ে রেখেছে বলেই মোটর ড্রাইভারদের যেমন চরিত্রদোষ থাকে সেরূপ চরিত্রদোষ তার কাছে কখনও আসতে পারবে না।

মধ্যবিত্তের ছেলে স্ব-ইচ্ছায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করেছে নিজের দেশকে জানবার জন্য। এমন লোকের সাথী হওয়া শুভ লক্ষণ বলতেই হবে। আমি কান্দাহার ছেড়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

চার

এখানকার হিন্দু যুবকদের একাদশী ক্লাব নামে একটি ক্লাব আছে, আমার যাত্রার আগে তাতে তারা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। আমিও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম। আসরে হাজির হবার পর সর্বপ্রথম আমাকে স্বাগত জানান হল কিন্তু সত্বরই আমি বিদায় নেব জেনে উপস্থিত যুবকগণ দুঃখ প্রকাশ করল। কিন্তু তখনও আমি একাদশী ক্লাবের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হইনি।

আমার কথা শেষ হয়ে যাবার পর, পেয়ালা ভর্তি করে সবাই ভাং খেতে লাগল। আমাকেও তা খেতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি কখনই জানিতভাবে ঐ পদার্থ পান করিনি। গাঁজাও শুরু হল। গাঁজার গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না বলেই সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। পর্যটক নানা অবস্থায় পতিত হয়। পর্যটক যদি তার স্বাস্থ্য ঠিক না রাখতে পারে তবে তার পর্যটন অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম স্বাস্থ্য কাকে বলে। সেজন্যই অভদ্রতা দেখিয়েও আমাকে একাদশী ক্লাব পরিত্যাগ করতে হল।

একাদশী ক্লাবে যেতে হিন্দু যুবকদের নিষেধ নেই। সবাই জানে একাদশী ক্লাবে কি হয়, অথচ মুষ্টিমেয় হিন্দু সমাজ তাকে নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। এঁদের সভা ছেড়ে এসে পথে দাঁড়ালাম এবং কতক্ষণ বাইরের মুক্ত বাতাস সেবন করে আশ্রমে চলে আসলাম। ভোলানাথ আমাকে দেখেই বললেন, আমি ভাল করেই জানি আপনি ওখানে বেশিক্ষণ বসতে সক্ষম হবেন না। কি ভুল শিক্ষা এখানকার হিন্দু যুবকদের মধ্যে তার নিদর্শন পেয়ে এলেন। যারা যৌবন বিকিয়ে দেয় শুধু ইন্দ্রিয় সুখভোগে তারা জাতের মেরুদণ্ড কি করে হতে পারে তা কে জানে।

ভোলানাথকে ছেড়ে আসতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু আসতে আমাকে হবেই। পথে এসে পড়লাম। সাথী পেলাম ইয়াকুবকে। ইয়াকুব আমার সাইকেল চালিয়ে আসতে লাগল। আমি ভাবিনি সাইকেল মোটরের সংগে টেক্কা দিয়ে আগে যেতে পারবে। শহর হতে বের হয়ে বেশি হয়তো দু' মাইল পথ ভাল পেয়েছিলাম তার পরই মোটরকারের চাকা কাদায় দেবে যেতে লাগল। আমি দেখলাম এরূপ অবস্থায় যদি মোটরে বসে থাকি তবে হয়তো আবার পায়ে ব্যথা শুরু হবে। সেজন্য ইয়াকুবের কাছ হতে সাইকেল নিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। কথা রইল সন্ধ্যার পূর্বে যদি মোটর আমার কাছে না পৌঁছতে পারে তবে আমিই ফিরে আসব।

সেদিন আমাদের গৃষ্ক নামক স্থানে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু গৃষ্ক পৌঁছান হয়নি, পথেই রাত কাটাতে হয়েছিল। আমাদের সংগে প্রচুর খাদ্য ছিল পথে কোনরূপ কষ্ট হয়নি। গৃষ্ক এবং কান্দাহারের মাঝে কোন গ্রাম নেই। কাঁকড় এবং কাদায় পূর্ণ উন্মুক্ত ময়দান। পথে দুদিন কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকাল বেলা আমরা গৃষ্ক পৌঁছলাম। সেখানে আমরা একটি ছোট ঘর ভাড়া করে সারাদিন বিশ্রাম করলাম। মোটর ড্রাইভার কোনরূপ বিশ্রাম করতে পেল না, কারণ তাকে মোটরের কলকবজাগুলি পরিষ্কার করতে হচ্ছিল।

গৃষ্ক ছোট গ্রাম। লোকসংখ্যা হাজারের বেশি বলে মনে হল না। তবে বেলুচিস্থান হতে উটের পিঠে করে পণ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানির ফলে এস্থানটি একটি বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গ্রামের মাঝ দিয়ে একটা মোটা পথ, তারই দুদিকে ছোট ছোট মেটে ঘর। কোনটাতে দোকান আর কোনটাতে ছোট ছোট কারখানা। কারখানাগুলিতে দুম্বার লোমের দ্বারা কম্বল দস্তানা পোস্তিন এবং প্রস্তুত হচ্ছিল। [illegible]

সমুদয় গ্রামখানা ইয়াকুবের সংগে বেড়িয়ে আসলাম। এমন কিছু দেখলাম না যা কারো কাছে বলা যেতে পারে, তবে লক্ষ্য করে দেখলাম অশিক্ষার একটা কৃষ্ণছায়া এখনও গ্রামটির ওপর পড়ে আছে, দারিদ্র্যের কংকাল মূর্তি নৃত্য করছে।

গৃজের পর হতেই শুরু হল আবার কর্দমাক্ত পথ। পথের দুদিকে কাদা নেই। মোটর চলার পথটাতেই কাদা। পথ ছেড়ে মোটর চলতেও পারে না। কর্দমাক্ত পথে মোটরকারে বসে সময় কাটাতে আমি পছন্দ করিনি। সেজন্য আমি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ত্রিশি মাইল চলে যেতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। কিন্তু মাল বোঝাই সাইকেল নিয়ে বোধ হয় তিন মাইল পথও চলতে সক্ষম হতাম না। ত্রিশি মাইল পথ এগিয়ে গিয়েও এমন একটা স্থান পাইনি যেখানে আশ্রয় নিতে সক্ষম হই। উত্তর দিকের পাহাড়গুলি ঢেউ খেলে আরও উত্তরে চলে গেছে, দক্ষিণ দিকে যতদূর দেখা যায় মাঠ ধীরে নিম্নগামী হয়ে গেছে। দুদিকের দৃশ্যাবলিই দেখার বস্তু ছিল। কিন্তু ভাবনা হল মোটর আজ ত্রিশি মাইল পথ আসতে সক্ষম হবে কি না।

যাহোক বিকালের দিকে কর্দমাক্ত মোটর এসে আমাকে উঠিয়ে নিল। আমরা আরও এগিয়ে গিয়ে একটি রুতবায় আশ্রয় নিলাম। পূর্বকালে বৈদেশিকরা ভারত আক্রমণ করতে এসে পথে পথে ঘরবাড়ি তৈরি করেছিলেন। সেই বাড়ি ঘরের আর অস্তিত্ব নেই, শুধু ইটের স্তূপ পড়ে আছে। কোন কোন রুতবায় লোকজন নেই, আর কোথাও বা কএকজন লোক এক পয়সার জিনিস পাঁচ পয়সায় বিক্রি করবার জন্য শিকারের অপেক্ষায় বসেছিল। আমাদের কাছে সকল জিনিসই থাকায় শিকারীদের মনে দুঃখ হয়েছিল। তাদের মনের দুঃখ হতে বাঁচবার জন্য আমি এক ডজন ডিম কিনেছিলাম।

একটা টিলার উপর বসিয়ে নিজেও কাছে বসলেন। তিনি বললেন, তিনি একজন আমেরিকান কণ্ট্রাকটার, আফগানিস্থানে জলের ভেল্প তৈরী করতে যাচ্ছেন। তাঁকে লণ্ডন প্যারী ইত্যাদি স্থানের লোক বলেছে যে আফগানিস্থান এখনও অসভ্য। তথায় খৃষ্টানদের প্রবেশ নিষেধ। যদি যেতে হয় তবে তাকে খাটি মুসলমান পোশাকে আফগানিস্থানে যেতে হবে। আমি তাঁকে বললাম, তিনি আফগানিস্থান সম্বন্ধে যা শুনেছেন তা একদম মিথ্যা। এখানে চোর ডাকাত পর্যন্ত নেই। আমার কথা আমেরিকান কণ্ট্রাকটারের বিশ্বাস হয়েছিল। তিনি আমারই সামনে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করে দাড়ি কামিয়ে ফেললেন। পাজামাকে আণ্ডারওয়ারে পরিণত করলেন। নেকটাইটি এটে বাঁধলেন। আমরা তার সংগে চা-পান সমাপ্ত করে, পথের ঠিক সমাচার জানিয়ে সবজাওয়ারের দিকে রওনা হলাম। আমরা বেশি ঘুম যেতে সক্ষম হইনি এরই মাঝে আমাদের মোটরও এসে পড়ে।

সবজাওয়ার ছোট একটি কস্‌বা। তাতে দশ পনর জন লোকের বাস। রাত কাটিয়ে পরের দিন্ আমরা ক্রমে নীচু অথচ ভাল পথ চলে বেলা দ্বিপ্রহের সময় হিরাতে পৌঁছি। হিরাতে আমি একটি হিন্দুর বাড়িতে অতিথি হই। ইয়াকুব গেরেযে চলে গেল।

হিরাতে হিন্দুর সংখ্যা সাত জন মাত্র এদের মাঝে কেউ বিয়ে করেন নি। প্রত্যেকেই লক্ষপতি, অথচ শহরে মন্দিরের সংখ্যা ছোট বড় নিয়ে এক শতেরও বেশি, তবে এসব আর বেশি দিন থাকবে না [illegible] মনে হয়। কারণ যখনই পাথরের দরকার হয় তখনই মন্দিরের কলা [illegible] পাথর তৈরির কাজে লাগাচ্ছে। 'ক্রএক ব্যাঙ্ক' পূর্বে একজন হিন্দু [illegible]। তিনি রেখে গেছেন তাঁর [illegible] টাকা। এই টাকা [illegible] [illegible] [illegible]। এই [illegible] করেই তিনি [illegible]

করেছিলেন যে, তিনি এক মস্ত কীর্তি রেখে অমর হয়ে থাকবেন। আমি মন্দিরগুলি দেখেছি বটে কিন্তু দেখে মনে দুঃখই হয়েছে। আমার ভেতর থেকে মন্দির-প্রীতি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ব্যবহারের উপযুক্ত মন্দিরগুলির সদ্ব্যবহার হচ্ছে না দেখেই আমার দুঃখ হয়েছিল। মন্দিরে উপাসনা করতে হিন্দু আর আসে না বলে যে দুঃখ হয়েছে তা নয়, হিন্দুর হিন্দুত্ব কিসে যায় তা জেনেছি বলেই। যদি তা না জানতাম তবে স্বগ্রামে বসে ভাবতাম আমি বেশ আছি। একটা কথা আছে ইগ্নরেন্স ইজ ব্লিস্ অর্থাৎ অজ্ঞ থাকা বড়ই সুখের। অজ্ঞ থাকার সুখ থেকে আমি নিজেকে অনেকটা বঞ্চিত করেছি।

যে হিন্দুর বাড়িতে গিয়ে আমি উঠেছিলাম সে একজন নানকপন্থী। লোকটি কাবুল ব্যাংকের ম্যানেজার এবং এখানে যত মোটর-টায়ার ও টিউব বিক্রি হয় সে তার এক চেটিয়া ব্যবসা করে। সে আমাকে যত্নের সহিতই স্থান দিয়েছিল। কিন্তু আমি তার চালচলন মোটেই পছন্দ করিনি। আমাকে একটা পৃথক ঘরে থাকতে দেওয়ায় লোকটির সংগে আমার সম্বন্ধ খুব কমই ছিল।

প্রথম দিনটা বিশ্রাম করে কাটিয়ে পরের দিন প্রাতে স্থানীয় ডাক্তার বাবুর সংগে সাক্ষাৎ করি। ডাক্তার জাতে বাঙালী, ধর্মে মুসলমান। আমাকে পেয়ে ডাক্তার বাবু বড়ই সুখী হয়েছিলেন।

সকালেই তিনি তাঁর বাড়িতে আমার খাওয়ার আয়োজন করলেন এবং দ্বিপ্রহরে আমাকে তাঁর হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। হাসপাতালে একশত বেড্। এক বৃদ্ধ [illegible] [illegible] পরিচালক। সারা আফগানিস্থানে [illegible]টা মেডিক্যাল [illegible] হয়েছে, তার মধ্যে হিরাত একটি।

হিরাতের গভর্নর খুব প্রগতিশীল লোক। [illegible]

চতুর লোক বলেই জানে। বাচ্চা-ই-সাকো হবিব উল্লা নাম নিয়ে যখন আফগানিস্থানের রাজা হলেন, হিরাতের গভর্ণর তখন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। হিরাতের গভর্ণর শুন্নি-মুসলমান। তাঁর কাছে ছোট বড় নেই। যে দিন মুসলিম ধর্ম এই পৃথিবীতে এসেছিল, সেদিন তাতে ছোট বড় বলে কিছুই ছিল না। হিরাতের গভর্ণর সে-ভাবই এখনও পোষণ করে থাকেন। তিনি ইসলামের ডিমক্রেসী বজায় রেখেছেন। বাচ্চ-ই-সাকো যখন নিহত হলেন, হিরাতের গভর্ণর তখন কিন্তু নাদির শাহের আনুগত্য স্বীকার করলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি গভর্ণর উপাধি বাজায় রাখলেন। কাবুল হতে যে আদেশ আসতে লাগল তা তিনি স্বীকার করে নিতে লাগলেন। অথচ রাজার আনুগত্য স্বীকার না করাটাই বা কেমন কথা? লোকে এ সম্বন্ধে নানা কথা বলে। লোকের কথায় আসে যায় না, শাসনকার্য চলেই যাচ্ছে।

আমরা জানি বাচ্চা-ই-সাকো-ই হবিব উল্লা নাম নিয়ে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু হিরাতের লোক বলে তাঁর আসল নাম ছিল বাচ্চা-ই-শিকা।

শিকা শব্দের মানে ধাতু-নির্মিত মুদ্রা, এবং সাকো মানে ভিস্তি। অতএব যারা হবিব উল্লাকে বাচ্চাই-ই-শিকা বলতে চায়, তারা বলতে চায় তিনি পয়সাওলার ছেলে আর তাঁর নাম বাচ্চা-ই—সাকো ধরলে বুঝায় তিনি ভিস্তিওলার ছেলে ছিলেন। যাকগে এইসব [illegible] কথা। তিনি শিকাই হোন, আর সাকোই হন, তিনি যা তিনি তাই ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল আসল, নাম নয়। পণ্ডিতগণ গবেষণা করে তাঁর আসল নাম স্থির করুন, আমি এই বই-এ তাঁকে বাচ্চা-ই-সাকো বলেই অভিহিত করেছি।

হিরাতের গভর্ণরের কয়েকটি নিয়ম মানতে হয়। সে নিয়ম-

রাজা হবিবুল্লা (রাজবেশে বাচ্চা ই-সাক্কো)

গুলি হল যে-কোন ভূ-পর্যটকই হিরাতে আসুন না কেন, তাঁকে গভর্ণরের কাছে যেতে হবে। পর্যটকের অভাব অভিযোগ জেনে গভর্ণর তার প্রতিকার করেন উপরন্তু প্রত্যেক পর্যটককে একশত টাকা করে দক্ষিণাও দেন। আমি হিরাত গভর্ণরের কাছে উপস্থিত হয়ে একখানি ছোট ছুরি এবং এক জোড়া রংগিন চসমার প্রার্থনা জানাই। কারণ এ দুটি জিনিসের আমার একান্তই অভাব ছিল। গভর্ণর আমার অভাব মোচন করে দিয়ে বললেন, আফগানিস্থান এখনও উন্নত হয়নি, আফগানিস্থানে এসে হয়তো আপনার অনেক দুঃখকষ্টই হয়েছে, আফগানিস্থানের লোকের পক্ষ হতে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আফগান জাতের মাঝে যদি কেউ আপনার কোন অনিষ্ট করে থাকে তবে তাদের ক্ষমা করবেন। পর্যটকদের পীড়া দিয়ে কোন লাভ হয় না। তাদের সন্তুষ্ট করাই ভাল, কারণ তাঁরা মরে যান সত্য কিন্তু দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁদের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁরা লিপিবদ্ধ করে যান তা মানব-সমাজের বহু কাজেই আসে। আপনার প্রতি যদি আমার দেশের লোক অন্যায় ব্যবহার করে থাকে তবে তা আপনি নিশ্চয় লিখবেন, সে বদনাম আমাদের চির দিনের তরে থাকবে। এজন্যই আমি ভূপর্যটকদের বৈদেশিক আক্রমণকারীদের চেয়েও বেশী ভয় করে থাকি। এই কথা বলে হিরাত গভর্ণর একশত টাকার একটি থলি আমার হাতে দিয়ে বিদায় দিলেন।

আফগানিস্থান স্বাধীন দেশ। সে দেশ সম্বন্ধে কিছু অন্যায় লিখলে তার প্রতিবাদ করার লোক আছে। সেজন্যই হয়তো আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখতে সাহস করে না। কিন্তু ভারতেরই অন্ন খেয়ে, বিদেশবাসী [illegible] ভারতবাসীরই আর্থিক সাহায্য পেয়ে অনেক পর্যটক, [illegible] যখন বই লিখেন তখন ভারতের বিরুদ্ধে নানা অসভ্য প্রচার [illegible]

কুণ্ঠিত হন না। এরূপ একটি লোককে আমি জানি। তার নাম ধাম বলে লাভ নেই, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে সে একজন পলাতক রুশ। দাসবৃত্তিতে তার অরুচি নেই। যারা রুশদের ইতিহাস পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন ডননদীর তীরবাসীরা ১৮৭১ সনেও ক্রীতদাসই ছিল। মহামতি লেনিন এদের মুক্ত করেন। পলাতক রুশরা দাস্য-বৃত্তি পছন্দ করত, সেজন্যই তারা স্বাধীনতা অপছন্দ করে বিদেশে পালিয়ে এসেছিল। এসব ক্রীতদাসদেরই একটি ভারতের নুন খেয়ে ভারতেরই বিরুদ্ধে অসত্য, অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্য উদগার করে বই লিখেছে। তাতে দুঃখ করার কিছুই নেই। মনে করতে হবে এটা তার দাসত্ব-কলংকিত নীচাশয় মনেরই পরিচয়, প্রকৃত পর্যটকের সত্য-দৃষ্টি নেই। এই লোকটি ইন্টার ন্যাশনাল নানসেন পাসপোর্ট এর সাহায্যে পৃথিবীর খানিকটা বেড়িয়ে ছিল। পৃথিবী পর্যটন করার সময় আমিও নানারূপ দুঃখকষ্ট ও অসদ্ব্যবহারে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। কিন্তু তা বলে শুধু সেই কারণেই কখনও আমি কোন একটা জাতের বিরুদ্ধে কোন বিকৃত তথ্য কিছুই লিপিবদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হইনি। আমি ভাল করেই জানি আজ যে অধম কাল সে ইবীরপুরুষ হয়ে সম্মান লাভ করবে।

হিরাত শহর বর্তমান যুগে যেমন মধ্য-এশিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, অতীত যুগেও এই শহরটির তেমনি খ্যাতি ছিল। তখন ছিল শৈবদের হিরাত, এখন হয়েছে কূটনীতিকদের। বাস্তবিক পক্ষেই এখানে আর ধর্মের স্থান নেই। মসজিদগুলিতে অতি অল্প লোকই প্রার্থনা করতে গিয়ে থাকে। তারা যেন ধর্মকে এড়াতে চায়। আফগানিস্থানের অন্যান্য অংশের মত হিরাতে এখনও চোরের হাত কেটে দেওয়া হয়। এতে বোঝা যায় ধর্মকে ছেড়ে দিলেও নৈতিক

উৎকর্ষকে খাটো করা হয় না। যে দেশ ধর্মাচরণ করে না অর্থাৎ শাস্ত্রের ছক-কাটা গোলক ধাঁধায় কলুর বলদের মত শুধু অভ্যাসবশেই ঘুরে বেড়ায় না, অনেকের মতে সে দেশ ঘোর অধঃপতিত, সেখানকার নাস্তিকদের মংগল নেই। কিন্তু জগতে ধর্মশানা জাতগুলি নৈতিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এমন কথা অতি বড় ধর্মধ্বজীও বলতে পারবে না। প্রকৃত মনুষ্যত্বের মাপকাঠি যে সব গুণ তার বিকাশ ধর্ম মানা-না-মানার ওপর নির্ভর করে না। স্বাধীন ভাবে যারা চিন্তা করতে শিখেছে তারা ধর্মকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে রাজি নয়।

পূর্বের কথামত ইয়াকুব এসে আমার সাথে যোগ দেয়। তাকে নিয়ে শহরটা ভাল করে দেখলাম এবং তাকে সংগে করে নিয়ে বাংগালী ডাক্তারের বাড়িতে আর একদিন গিয়ে উঠলাম। ডাক্তার বাড়িতেই ছিলেন। আমাকে ওপরে গিয়ে বসতে বলায়, ইয়াকুবও যখন আমার পেছন পেছন চলল. তখন ডাক্তার ঘাবড়ে গেলেন। আমি ডাক্তারকে অভয় দিয়ে বললাম, ভয় নেই ডাক্তার এই ছেলেটিও প্রগতিশীলদেরই একজন।

ডাক্তারের বাড়িতে চা খেয়ে ডাক্তারকে বললাম, আমি এই ছেলেটিকে নিয়ে রুশ সীমান্ত দেখে আসব যাব। হয়তো দুএক দিনের মাঝেই রওয়ানা হব। যদি এই ছেলেটি আপনার কাছে কখনও কোন দরকারে আসে তবে একে সাহায্য করবেন। ডাক্তার তাতে রাজি হলেন। আমি ইয়াকুবের হাত ধরে ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম।

হিরাতের বাজারে গিয়ে দেখলাম সেখানে জাপানী মালে বাজার ছেয়ে আছে। হিরাতবাসী ব্যবসায়ীরা বেলুচিস্থানের ভেতর দিয়ে নিয়ে এসে সেই মাল সস্তায় বিক্রি করছে। একটি দোকানে [illegible]

দেখলাম ভারতীয় সিগারেট বিক্রি হচ্ছে। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে ইয়াকুবকে বললাম, দেখলে ইয়াকুব, এটাকেই বলে ন্যাশনেলইজম্ বা স্বদেশিয়ানা। ভারতে হয়তো সিগারেটের পেকেটটি মাত্র তৈরী হয়েছে, তবু আমার মন আপনা থেকেই 'ভারতে প্রস্তুত' জিনিসটির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তবুও বলি, 'স্বদেশে তৈরী জিনিস দেখলেই যে ভাবে গদগদ হতে হবে তারও হেতু নেই। আমরা এক নতুন দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতে শিখছি। আমরা দেখি জিনিসের প্রকৃত নির্মাতা যারা তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেল কি না। যদি শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে থাকে, তবে সে জিনিস স্বদেশের হলেও অপবিত্র এবং অপবিত্র জিনিস সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

ইয়াকুব আমার কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

হিরাতে দেখার মত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সুতরাং পরদিনই ইয়াকুবকে সংগে নিয়ে আবার যাত্রা করলাম আর এক নতুন লক্ষ্যের দিকে।

শেষ